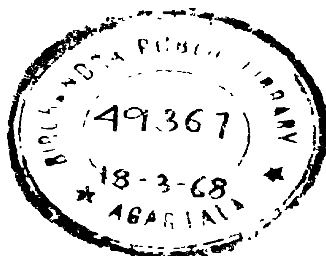
রক্তাক্ত ইন্দোনেশিয়া

চিরঞ্জীব সেন



বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ :
ভাদ্র, ১৩৫৫

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
১১এ বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭

মুদ্রক :
স্বকুমার ভাণ্ডারী
রামকৃষ্ণ প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :
খালেদ চৌধুরী

ছ' টাকা

কল্যাণীয়া পত্রলেখা

ও

কল্যাণীয় আবিরকে

—মেশোমশাই

এই লেখকের অন্যান্য বই :

অপরাধীর মিছিল
ডাক্তার যদি অপরাধী হয়
আয়েষার শেষ রজনী

এই কাহিনীর চরিত্রগুলি কাল্পনিক হলেও মূল কাহিনী কাল্পনিক নয়। ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিক কাহিনী অনুসরণ করেই এই কাহিনী রচিত।

এই কাহিনী রচনায় বন্ধুবর শ্রীকিরণকুমার রায় আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

চিরঞ্জীব সেন

সমুদ্র মেখলা বেষ্টিত দ্বীপমালার রূপময়ী দেশ ইন্দোনেশিয়া। ছোট বড় নানা আকারের প্রায় তিন হাজার দ্বীপ নিয়ে গঠিত একটি অদ্ভুত দেশ। সমুদ্রের কলকল তরঙ্গরাশি এসে লুটিয়ে পড়ছে বালুবেলায়। নারকেল আর কদলীবৃক্ষের ঘন অরণ্য পার হয়ে ধানের বিস্তৃত ক্ষেত, রবারের এস্টেট, খনি আর ছোট ছোট কুটির-ঘেরা গ্রাম। দূরে দূরে প্রাসাদগর্বী শহর। সেরা শহর জাকার্তা; ডাচ শাসকদের তিলে তিলে গড়া পূর্বতন বাটাভিয়া এখন নতুন নাম জাকার্তা, দেশের রাজধানী।

জাকার্তা শহরের প্রধান রাস্তার উপর একটি বিখ্যাত বিভাগীয় বিপণিতে কেনা-কাটার ভিড় জমে উঠেছে।

বিরাট দোকানের ভাগে ভাগে নানা সামগ্রীর বিক্রয়ের ব্যবস্থা। কোথায়ও পোশাক-পরিচ্ছদ, কোথায়ও প্রসাধন ও উপহার দ্রব্য, কোথায়ও শয্যাদ্রব্য বা টুকিটাকি জিনিসের কেনাবেচা চলছে। চামড়ার নানাধরনের ব্যাগ বিক্রির অংশে সেলসগার্ল লখমি খুব ব্যস্ত, একসঙ্গে দু-তিনজন খরিদ্দারকে জিনিসপত্র দেখাচ্ছে, ক্যাশমেমো কাটছে। কতক্ষণ এমনভাবে খেটে চলেছে কে জানে, কপালে কিছু কিছু ঘাম জমে উঠেছে, অথচ মুখের হাসিটি একটুও ম্লান হয় নি।

পাশের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে একজন মিলিটারি পোশাক পরা যুবক নির্নিমেষ দৃষ্টিতে লখমির দিকে তাকিয়েছিল। দৃষ্টির মধ্যে একটা চুম্বক-শক্তি আছে। হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়ল লখমির।

সঙ্গে সঙ্গে লখমির সারা শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহ সঞ্চারিত হয়ে গেল।

মুহূর্তের জন্য বোধ করি কেঁপে উঠল।

কিন্তু মুখের হাসিটি নিভল না।

খরিদ্দারদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই চোখের ইঙ্গিত জানিয়ে ডাকল যুবকটিকে।

খরিদ্দারদের মাঝখানে এসে দাঁড়াল যুবকটি। চোখের তারায় অদ্ভুত দৃষ্টি।

হাসিমুখে এগিয়ে গেল লখমি। বলল, অনেকদিন পর, ভাল আছো তো?

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে যুবকটি বলল, তোমার সঙ্গে আমার সামান্য একটু দরকার আছে। দোকান বন্ধ হবার পর পাশের রেস্তোয়াঁর এসো। আমি অপেক্ষা করব।

বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটছে লখমির।

তবু হাসিমুখে বলল, আচ্ছা।

তারপর একবার ঘড়ির দিকে তাকাল। দোকান বন্ধ হতে আরো দেড় ঘণ্টা বাকি।

খরিদ্দারদের দিকে আবার মন দিল লখমি।

যুবকটি নিঃশব্দে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

চামড়ার ব্যাগ, সুটকেস, পোর্টফোলিও, তাদের নানারকম আকার, গায়ে নানাবিধ নক্সা। খরিদ্দারদের রুচি ও মর্জিও বহুপ্রকার।

জিনিসপত্র দেখানো, ওদের গুণগান বর্ণনা করে খরিদ্দারদের পছন্দ করান, তারপর ক্যাশমেমো লেখা ইত্যাদি নিত্যকার কাজে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল লখমি।

ছোট্ট রুমালটা কামিজের পকেট থেকে বার করে মুখ মুছল।

বেচাবিক্রির কাজে নিমগ্ন থাকলেও তার মনের মধ্যে একটা কথাই ক্রমাগত বেজে চলেছিল।

জাহির একটা কথা বলতে চায়।

কি কথা ?

খুব গম্ভীর, খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা কী ? তার ভাবভঙ্গীতে তাই মনে হল। নাকি মিলিটারি চাকরিতে এই সদ্য ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত হওয়ায়, আচার আচরণ ভাবভঙ্গীতে একটা কৃত্রিম রাসভারী মনোভাব ফুটিয়ে তুলেছে। তার বেশী গুরুত্ব নেই তার জরুরী কথাটার।

অবশ্য কিশোর বয়স থেকে জাহির গম্ভীর প্রকৃতির। কম কথা বলে, প্রায় হাসেই না আর যা চায় ভয়ঙ্কর তীব্রভাবে আশা করে।

না পেলে পাগল হয়ে যায়।

অথচ শাহির সে তুলনায় এখনও ছেলেমানুষ। সর্বক্ষণ হাসিখুশি মুখ, কৌতুক আর উচ্ছলতা নিয়ে সজীব, চঞ্চল, ফুর্তিবাজ মানুষ।

জাহির আর শাহির দুই ভাই।

অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল লখমির।

পিঠোপিঠি দুই ভাই জাহির আর শাহির, ধর্মে মুসলমান। তাদের সঙ্গেই মানুষ হয়েছে লখমি। লখমি ধর্মে হিন্দু। শাহির আর জাহিরের বাবা হুসেন সাহেব লখমিকে মেয়ের মত মানুষ করেছেন।

জাকার্তার উপকণ্ঠে এক পুরনো ডাচ ব্যুরোক্রেটের বিরাট বাড়ি কিনেছেন ডঃ হুসেন। তিনি বিপত্নীক। দুই ছেলেকে মায়ের মত স্নেহ ও যত্নে মানুষ করেছেন। আর পিত্রোচিত মমতায় প্রতিপালন করেছেন লখমিকে।

কিন্তু কি কথা বলতে চায় জাহির ?

শাহির এক ডেলিগেশনে গেছে সুমাত্রা দ্বীপের প্রান্তীয় শহর কুতারাজাদায়। যেখানে অনুষ্ঠিত হবে নিখিল ইন্দোনেশীয় যুব উৎসব। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ তার উদ্বোধন করবেন।

জাহির কি এই সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল? শাহিরের অনুপস্থিতির সুযোগ।

খরিদ্দারদের ভিড় একটু পাতলা হয়ে এসেছে। বিরাট দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকাল লখমি। দোকান বন্ধ হতে এখনও আধ ঘণ্টা বাকি।

অ্যাটেণ্ডাটকে এক কাপ কফির অর্ডার দিল লখমি।

কফি খেতে খেতে গল্প করল সহকর্মীদের সঙ্গে। সুলতানা কানের কাছে মুখ এনে নিচু স্বরে বলল, ব্রিগেডিয়ার জাহিরকে যেন দেখলাম লখমি, কি ব্যাপার? তুই কি দ্রৌপদীর পার্ট করবি নাকি?

নাচের কথা বলছিস?

নাক টিপে দিয়ে সুলতানা হাসি মুখে বলল, কচি খুকি কিছুই জানেন না যেন! এদিকে ডুডুও খাবেন, টামাকও খাবেন!

যাঃ!

সুলতানা লখমির অন্তরঙ্গ বান্ধবী। সব খবরই জানে। এবার রসিকতা ছেড়ে সুলতানা জিজ্ঞেস করল, শাহির তো ডেলিগেশনে গেছেন, না?

হ্যাঁ।

একটুক্ষণ চুপচাপ কি ভাবল সুলতানা। লখমির মনেও উদ্বেগের কাল মেঘ। কিন্তু হাসিটি এখনও মলিন হয় নি।

সাবধানে থাকিস।

কেন রে?

শুনছি সুম্বা দ্বীপে সামরিকবাহিনী একটা বিদ্রোহের চেষ্টা করেছে। বাং * কর্ণ'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

লখমি বলল, আমিও শুনেছি।

---

* 'বাং' শব্দের অর্থ 'ভাই'। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণকে ইন্দোনেশিয়া জনসাধারণ প্রীতির সঙ্গে সম্বোধন করত।

বাং কর্ণ আজকাল একটু কমিউনিস্ট ঘেঁষা হয়েছে, তাই সামরিক বাহিনীর মধ্যে অসন্তোষটা তীব্র হয়ে উঠেছে।

হুঁ।

শাহির তো কমিউনিস্ট ?

হ্যাঁ।

হাসল সুলতানা। বলল, বাঃ একভাই কমিউনিস্ট নেতা, আরেক ভাই মিলিটারি ব্রিগেডিয়ার !

লখমি জবাব দিল না।

এবার রাজকন্যা দ্রৌপদী কাকে স্বয়ম্বরা হবেন ?

সুলতানার গালে ছোট্ট একটা চড় বসিয়ে লখমি সরে গেল। বাথরুমে গিয়ে কল খুলে মুখে চোখে জলের ছিটে দিল। তোয়ালে দিয়ে ভাল করে মুখ ঘষল। তারপর মৃদু পাউডারের প্রলেপ বুলিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে ফিকে লাল রঙের লিপস্টিক বুলিয়ে নিল।

সনাতন মেয়েলি প্রসাধন।

দোকান বন্ধ হবার পর ত্রস্ত পায়ে রাস্তায় নেমে এল লখমি। পাশেই কয়েকটা বাড়ির পর রেস্তোরাঁ।

ডাচ আমলে নাম ছিল 'দি রয়াল রেস্টুরেণ্ট', ওলন্দাজ সাহেবদের খুব প্রিয় খানাপিনা আর নাচের রেস্তোরাঁ। এখন হাতবদল হয়ে এক প্রাক্তন সুলতানের নাতি কিনে নিয়েছেন। নাম দিয়েছেন 'দি রিপাবলিক রেস্টুরেণ্ট'। ডাচ সাহেবদের স্থানে এখন যে সব ইন্দোনেশিয়ান শাসন-বিভাগে উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত, তাঁরা এখানে নিয়মিত আসর জমান। তাছাড়া সামরিক বিভাগের কর্তাদেরও দেখা যায়। সমাজের ধনী ও অভিজাত নরনারীর এখানে নিত্য উৎসব লেগেই আছে।

রেস্তোরাঁর রিভলভিং গেট পেরিয়ে লখমি ঢুকে গেল বিরাট লাউঞ্জে। চোখ পড়ল কোণার দিকে একটা সোফায় বসে আছে

জাহির, সামনের টেবিলে রাখা একটি গ্লাস। তাতে সোনালি রঙের মৃদু উচ্ছলিত সুরা।

লখমি নিঃশব্দে এসে পাশে বসল।

এই মানুষটিকে বহুকাল থেকে জানে লখমি। যখন বারো কি তের বছর, তখন থেকেই জাহির আর শাহিরের সঙ্গে একই বাড়িতে থেকে বড় হয়ে উঠেছে লখমি।

শাহির বাচ্চা বয়স থেকেই দুরন্ত। জাহির গম্ভীর, রাশভারী। কিন্তু আর কেউ না জানলেও লখমি জানে, জাহির সাহসী নয়।

লখমির প্রতি জাহিরের অনুরাগটা অন্তত লখমির কাছে লুকোন নেই।

জাহির লুকিয়ে লখমিকে দেখত। অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলতে চাইত। কিন্তু পারত না। শাহির যেমন অবলীলায় লখমির কাঁধে হাত রেখে গালে চিমটি কাটত; জাহিরের পক্ষে তা ছিল অসম্ভব।

পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে জাহির। এক মাস রোজা পালন করে। লখমি শিব-পার্বতীর পুজো দেয়। লখমি বালি দ্বীপের মেয়ে, হিন্দু পরিবারের কন্যা। আগে সারা দেশটাই ছিল হিন্দু। এখন বালি দ্বীপ ছাড়া ইন্দোনেশিয়ার অন্যান্য দ্বীপের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান। কিছু বৌদ্ধ আছেন, অল্প কিছু খৃষ্টান।

জাহির গোঁড়া মুসলমান। ইসলামী শরিয়তে দেশের ও সমাজের রীতিনীতি চালু হোক, মনেপ্রাণে তাই চায়।

অথচ লখমি হিন্দু।

শাহির হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়। সমস্ত ধর্মেই তার প্রবল অবিশ্বাস। ধর্ম নিয়ে সে মাথাই ঘামায় না। দেশে সাম্যবাদের ভিত্তি গড়ে উঠুক, এই তার প্রার্থনা।

নিঃশব্দে ব্রিগেডিয়ারের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল লখমি। জাহির আজ আরো গম্ভীর, আরো চিন্তামগ্ন। বেশ খানিকটা পরে জাহির বলল, জান, বাবার শরীর ভাল নেই।

কি হল ?

আন্তরিক উদ্বিগ্নতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল লখমি।

প্রায়ই মাথা ঘোরে।

আচ্ছা, আমি শুক্রবার সকালে বাড়ি যাব। বাবাকে দেখে আসব। ওষুধগুলি নিয়মিত খান তো ?

বলেন তো খাই। তবু আমার বিশ্বাস হয় না।

হুঁ।

শোন।

বলুন।

খানিকক্ষণ কথা বলল না জাহির।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে লখমি।

তারপর এক মুহূর্তের জন্য লখমির চোখের দিকে তাকিয়ে জাহির বলল, আজ দোকানে তোমাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। তোমার কাজের চেহারাটা একেবারে অন্যরকম।

লখমি জবাব দিল না। তার বুকের মধ্যে হাতুড়ির শব্দ।

জানো ?

বলুন।

কানের কাছে মুখ এনে প্রায় ফিস ফিস করে বলল জাহির ; কয়েকদিনের মধ্যেই সুমাত্রায় একটা বিদ্রোহ ঘটবে, সাবধানে থেকো।

কার বিরুদ্ধে ?

এই কমিউনিস্ট ঘেঁষা সরকারের বিরুদ্ধে।

বাংকর্ণর বিরুদ্ধে ?

না। তিনি আমাদের প্রেসিডেণ্ট। কিন্তু তাঁকে মন্ত্রিসভা বদল করতেই হবে। নইলে দেশটা দেশদ্রোহী কমিউনিস্টদের খপ্পড়ে পড়ে যাবে।

মন্ত্রিসভা বদল করতে যদি বাং কর্ণ রাজী না হন ?

তিনি হবেনই। তাঁকে বাধ্য করার জন্যই বিদ্রোহ হবে। তুমি সেই কয়টা দিন হোস্টেল ছেড়ে বাবার কাছে বাড়িতে থেকো। এটা আমার অনুরোধ।

হুঁ। শাহিরও বাড়ি নেই, বাবা একা। আমি নিশ্চয়ই থাকব বৈকি।

ভ্রূকুঞ্চিত করে কিছুক্ষণ কি ভাবল লখমি। তারপর জিজ্ঞেস করল, একটা কথা জিজ্ঞেস করি?

বলো।

এ বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে আপনার কি কোনপ্রকার ক্ষতি হতে পারে?

জাহির তাকাল লখমির দিকে। জাহির ভাবল, কি জানতে চায় লখমি? বিদ্রোহের সঙ্গে আমি কতখানি জড়িত, বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে আমার প্রাণদণ্ডের সম্ভাবনা আছে কিনা? কোনটার স্পষ্ট জবাব দিল না জাহির। শুধু বলল, তুমি বাবাকে দেখো, তাহলেই আমি নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারব।

আমার কথার জবাব দিলেন না?

এ প্রশ্নের জবাব নেই। আচ্ছা উঠি। এসো তোমাকে বাসে এগিয়ে দিই।

কাউন্টারে এসে বিল চুকিয়ে দিল জাহির। লখমির পাশাপাশি হেঁটে এল। রাস্তায় ভিড় অনেক কমে এসেছে। চীনা পাড়ায় কি একটা উৎসব, ওরা মিছিল বের করেছে, আতসবাজি পোড়াচ্ছে। ওদের চোখে মুখে পার্বণের আনন্দ।

কিন্তু চিন্তিত মুখ জাহিরের। লখমির মুখও অন্ধকার।

রাত্রিতে নিজের ঘরে একা বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ঘুম এলো না লখমির।

পেছনে ফেলা দিনগুলির কথা আজ এত বার বার মনে পড়ছে কেন?

বালি দ্বীপের একটি ছোট্ট শহরে কাঠের বাড়িতে ছেলেবেলা কেটেছে লখমির। বাবা থাকতেন বাটাভিয়া শহরে, ডাচ কোম্পানির কেরানী ছিলেন তিনি। সেই বাটাভিয়া শহরেরই এখন নাম হয়েছে জাকার্তা। বিদেশী প্রভাব মুক্ত হয়ে স্বদেশী হয়েছে।

ডাচদের অফিসে কাজ করলেও বাবা ছিলেন মনেপ্রাণে জাতীয়তাবাদী। বাটাভিয়া কলেজে পড়ে নেদারল্যাণ্ডের আমস্টার্ডম বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতে ডক্টরেট হয়েছিলেন। অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন ডঃ হুসেন। তিনিও সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যায় ডক্টরেট।

এত বিদ্যা নিয়েও স্বদেশে ফিরে উঁচু কাজ পান নি লখমির বাবা ডঃ সেনাপতি কিংবা তাঁর বন্ধু ডঃ হুসেন। সরকারী যন্ত্রের সমস্ত উঁচু পদেই ওলন্দাজ সাহেবদের জন্য নির্দিষ্ট, দেশীয় লোকদের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। শুধু কেরানী পদ পর্যন্ত উঠতে পারত দেশের বিদ্বান লোকরা। তার বেশি উচ্চাশা করার অধিকার ছিল না।

লখমির বাবা ডঃ সেনাপতি আর ডঃ হুসেনকে সরকার অনেক কৃপা করে দপ্তরের দুই শাখার হেড ক্লার্ক পদ দিয়েছিলেন। ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন দুজনই।

তখনকার দিনে কলেজের অধ্যাপক পদেও দেশীয় মানুষদের নেওয়া হত না।

ডঃ সেনাপতি ও ডঃ হুসেন ইস্কুলের মাস্টারি নিয়েছিলেন। তখন থেকেই তারা ন্যাশনালিস্ট দলের কর্মী। বাং কর্ণ তাঁদের সমসাময়িক। যদিও বয়সে ছোট।

ডঃ সেনাপতি ছিলেন উগ্রপন্থী জাতীয়তাবাদী। ওলন্দাজদের অবিলম্বে দেশ ছাড়া করতে না পারলে যে দেশের মানুষদের কোনদিকেই মঙ্গল হবে না, এটা সবাই উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু বিদেশীদের দেশছাড়া করার পথ নিয়েই ছিল মতান্তর।

ডঃ সেনাপতি চাইতেন অবিলম্বে বিদ্রোহ।

ইন্দোনেশিয়ার আদর্শ তখন ভারত।

ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য দিয়েই ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় সংস্কৃতি পুষ্ট। ধর্মে মুসলমান হলেও রামায়ণ ও মহাভারতের এবং অসংখ্য ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী এখনও ইন্দোনেশিয়ার মানসজগতের ভিত্তি। রাম সীতা কিংবা পাণ্ডবের বনবাস নিয়ে যাত্রা, নৃত্যনাট্য বা পুতুল নাচের আসর শুধু বালি দ্বীপেরই একচেটিয়া নয়, সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপে দ্বীপে জাতীয় মানসলোকের মাটি গড়ে তুলেছে।

আধুনিক ভারতের সঙ্গেও ইন্দোনেশিয়ার অনেকখানি মিল। ভারত ইংরেজের পরাধীনতা শৃঙ্খলে বন্দী, ইন্দোনেশিয়া ডাচ শাসকদের। ভারতেও পরাধীনতা মোচনের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রাম, ইন্দোনেশিয়াতেও তাই।

ভারতের সুভাষ বসুর মত ডঃ সেনাপতি চাইতেন আপোষ বিরোধী বিপ্লব। ক্রমশঃ তিনি সশস্ত্র বিদ্রোহে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু ডঃ হুসেন চাইতেন আইন মাফিক অসহযোগিতা। সশস্ত্র বিদ্রোহ করে শক্তিমান ওলন্দাজ সরকারকে হঠান সম্ভব নয় বলেই ছিল তাঁর ধারণা। বিদেশী সরকারের সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী, স্তূপীকৃত মারণাস্ত্রের সম্ভার আর দেশের মধ্যে বিরাট একদল দাস মনোভাবাপন্ন মানুষের অকুণ্ঠ আনুগত্য এমন এক সুদৃঢ় সরকারের ভিত্তি গড়ে তুলেছিল যে, ক্ষুদ্র এক বিপ্লবীগোষ্ঠী এই ভিত্তি নড়াতে পারবে বলে ডঃ হুসেন কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। তিনি চাইতেন গণ অভ্যুত্থান। আস্তে আস্তে বিদেশী সরকারের কাছ থেকে শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া।

ডঃ সেনাপতি অট্টহাসি হাসতেন।

বলতেন, হুসেন, এটা রাজনীতি নয়, তোমার স্বপ্ন মাত্র। কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে না।

রাজনীতি ও দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথ নিয়ে দুই বন্ধু তর্কে মাততেন।

সেই তর্ক কখনো শোনে নি লখমি।

এ সব কথা লখমি শুনেছে কিছু তার মায়ের কাছে। পরে নিজেই বলেছেন ডঃ হুসেন।

মায়ের কথা মনে পড়ে লখমির।

খুব ভাল নাচতে পারতেন মা। নৃত্যনাট্যের সেরা পার্টটা ছিল তাঁর বাঁধা। প্রায় সময়ই সীতার বা দ্রৌপদীর ভূমিকা।

লখমিকে নাচ শেখাতেন তিনি।

রামায়ণ মহাভারত মুখস্থ করাতেন।

মা খুব সুন্দরী ছিলেন দেখতে। আজও তাঁর ফটো আছে লখমির বাক্সে। নানা ভঙ্গীতে তোলা ফটোগ্রাফ। প্রায় সবগুলিই বাবার তোলা। নাচের ছবি, ঘরের লক্ষ্মী হিসেবে চেয়ারে বসা অবস্থায় তোলা ছবি, আনাজ কাটা, রান্না করার সময়কার নানা ছবি।

ছবিগুলি দেখে বোঝা যায় বাবা খুব ভালবাসতেন মাকে। বাবার লেখা মায়ের কিছু প্রেমপত্রও আছে তোরঙ্গে তোলা।

মায়ের কথা প্রায় স্পষ্ট মনে পড়ে। কিন্তু বাবাকে ভাল মনেই পড়ে না।

শুনেছে দীর্ঘকায় সুগঠিত দেহী তেজস্বী পুরুষ ছিলেন বাবা। গায়ের রঙ ছিল তামাটে। কিন্তু দেখতে সুদর্শন ছিলেন।

বাল্যকালেই বাবা হারিয়ে গেলেন কোন অন্ধকারে, কোনদিন আর দেখা হল না।

ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন করেছিলেন বাবা। বাটাভিয়া শহরের উপকণ্ঠে গোপন ঘাঁটি গড়ে তুলেছিলেন সাচ্চা বিপ্লবীদের নিয়ে।

হংকং আর সিঙ্গাপুর থেকে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন।

ইতালি আর জার্মানী থেকেও পিস্তল, বন্দুক ও গোলাবারুদ আনাবার অদৃশ্য পথ ছিল।

নামে যেমন সেনাপতি, কাজেও ছিলেন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আত্মব্রতী সৈন্যদলের অধিনায়ক।

এই সৈনাপত্য ছিল গোপন। পেশায় ছিলেন একটি জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

মাঝে মাঝে আসতেন বাড়িতে। দিন কয় কাটিয়ে যেতেন। মাকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন বাটাভিয়া শহরে। কিন্তু মা যেতে চান নি।

মা ছিলেন ভক্তিমতী হিন্দু রমণী।

পুরো ইন্দোনেশিয়ায় একমাত্র বালি দ্বীপেই হিন্দুধর্ম প্রচলিত। অন্যত্র ইসলাম।

বাটাভিয়ার রাজধর্ম খৃষ্টান, দেশীয় ধর্ম ইসলাম। কোনটার সঙ্গেই মার তেমন খাপ খেতো না, তাই বালি দ্বীপের বাড়িতেই থাকতে চাইতেন।

বাবাও আর জোর করেন নি।

বাবার কাছে ধর্ম বড় কথা ছিল না; তাঁর কাছে স্বদেশ থেকে মহৎ কিছু ছিল না। বলতেন, জন্মভূমি আমার কাছে স্বর্গের থেকেও বড়।

শেষদিকে বাড়িতে এসেও বাবা নাকি কেমন অন্যমনস্ক থাকতেন। সব সময় কি যেন ভাবতেন। মা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন।

একদিন রাত্রিতে বাবা বাড়ি এসেছেন। সঙ্গে কোন মালপত্র নেই। এসব কথা মার কাছে শোনা।

খুব আস্তে আস্তে বাবা দরজায় টোকা দিয়েছিলেন। মা নাকি চমকে উঠেছিলেন। চীৎকার করে বলেছিলেন, কে?

—আমি।

মা ততোধিক চীৎকার করে বলেছিলেন, আমি কে?

—আস্তে। দরজা খোল।

জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বাবা। কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়েছিলেন মা।

দ্রুত ঘরে ঢুকে দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়েছিলেন বাবা। তারপর বিছানায় ঘুমন্ত চার বছরের মেয়ে লখমির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

বাবার ডান হাতে আর ডান পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। কেমন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছেন।

আর্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিলেন মা, কী হলো? ওগো কথা বলছ না কেন?

মেয়ের কাছ থেকে ফিরে মার চোখের দিকে তাকিয়েছিলেন বাবা। সে চোখে ক্লান্তি, আগুন, ক্রোধ, আশাভঙ্গ, অনেক কিছুর রশ্মি ছিল।

বাবা বলেছিলেন, হেরে গেলাম! এবার পালাতে হবে।

কী বলছ? মা উৎকণ্ঠিত।

ওলন্দাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করলাম। পারলাম না। হটে যেতে হল।

কোথায়?

সুমাত্রা দ্বীপে।

মা চুপচাপ বাবার পায়ে হাত দিয়ে বসেছিলেন।

বাবা বলেছিলেন, সুমাত্রা দ্বীপে ওলন্দাজদের বড় রবার বাগানের ক্লাবঘরে সেদিন গভর্ণরের সম্বর্ধনা ছিল। খানাপিনা আর বলনাচের মহোৎসব। অতর্কিতে আক্রমণ করেছিল বিপ্লবী দল। তাঁদের নেতা ছিলেন সেনাপতি স্বয়ং।

কাঁটা তারের বেড়া ঘেরা বিরাট এলাকাটার ঠিক মাঝখানে

প্রশস্ত গেট। ওলন্দাজ স্থাপত্যরীতিতে তৈরি অনেকটা দুর্গের প্রবেশ পথের মত দেখতে। দুদিকে বন্দুক হাতে দুজন প্রহরী।

ঠিক মাঝরাতে অতর্কিতে আক্রমণ করা হয়েছিল প্রহরীদের। কাবু করতে বেগ পেতে হয় নি।

ওদের বেঁধে মুখে কাপড় গুজে দেওয়া হয়েছিল। তারপর ওদের পোশাক খুলে নিয়ে পরেছিল দুজন বিপ্লবী। ওদের হাতের বন্দুক নিয়ে ওদের মত কায়দা করেই ওরা গেট পাহারার ভান করছিল।

তখন ক্লাবঘরের শ্বেতাঙ্গ নর-নারীদের মাথায় সুরার উত্তেজনা।

বীটোফেনের বিকৃত সুরের রিমিঝিমি পিয়ানোর রীডে কারো কারোর মনে তখনো নাচের নামে আসঙ্গলিপ্সার তীব্রতা।

হঠাৎ কয়েকটা বন্দুক একসঙ্গে গর্জন করে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাগানের বাতি নিভে গিয়েছিল।

স্ত্রীলোকদের আর্তনাদ আর পুরুষদের চীৎকার মিশে গিয়ে একটা ভয়াবহ কোলাহল উঠেছিল। তারই মধ্যে দৌড়াদৌড়ি হুটোপুটি আর হুলুস্থুলুস।

গভর্ণরের শ্বেতাঙ্গ সৈন্যরা তীব্র হুইসেল বাজিয়ে ক্লাব ঘরটা ঘিরে ধরেছিল।

অনেকক্ষণ পর বাতি জ্বলেছিল।

তিন জন শ্বেতাঙ্গকে দেখা গেল রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন গভর্ণর নিজে। বাকি দুজন তাঁর প্রধান উপদেষ্টা।

দু'দিন পর ওরা তিনজনই বাটাভিয়ায় সাহেবদের হাসপাতালে মারা যান।

জানালা দিয়ে তাক করা অব্যর্থ লক্ষ্য নিষ্ঠুর উৎপীড়নের প্রতিশোধ নিয়েছিল।

কোন স্ত্রীলোকই আহত হন নি।

ক্লাবঘরের মেঝেতে একটি কাগজের বড় পুঁটুলি পাওয়া যায়। তাতে ডাচ ভাষায় লেখা ছিল :

"দেশীয় লোকদের উপর নৃশংস অত্যাচারের প্রতিফল। সাবধান। এদেশ ছেড়ে চলে না গেলে প্রত্যেকটি সাম্রাজ্যবাদী অনুচরকে অচিরে যমালয়ে পাঠান হবে।"

বাতি জ্বলার পর শ্বেতাঙ্গ সৈন্যরা চারদিকে ছুটল। কিন্তু কাউকে ধরতে পারল না।

ধানের ক্ষেতের মধ্যে পাওয়া গেল রজ্জুবদ্ধ দুজন প্রহরীকে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেও কিছু জানা গেল না।

কিন্তু ওলন্দাজ সরকাবের গুপ্তচর বাহিনী নীরব ছিল না। ওরা ডঃ সেনাপতি ও তাঁর সঙ্গীদের সামান্য সামান্য খবর জানত। কিন্তু তাঁদের কার্যকলাপ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়ার মত সাক্ষ্য প্রমাণাদির অভাব ছিল।

নিখোঁজ ডঃ সেনাপতি।

গুপ্তচরদের সন্দেহটা আরো গাঢ় হয়ে উঠেছিল।

বান্দুং শহরের একটি বারবনিতা পল্লীর গোপন আস্তানায় আশ্রয় নিয়েছিলেন ডঃ সেনাপতি আর তাঁর সেরা সহকারী সাজ্জাদ।

আরো ব্যাপক ও বলিষ্ঠ সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। গভীর দেশপ্রেমের সঙ্গে অসীম সাহসের অঞ্জলি দিয়ে সাড়ে তিনশ বছরের পরাধীনতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

তাঁরা আরো বিরাট আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন।

হঠাৎ একদিন প্রত্যুষে পুলিশ বারবনিতালয় ঘেরাও করে দাঁড়িয়েছিল।

বেরোবার পথ বন্ধ।

মেয়েদের জিজ্ঞাসাবাদ করছিল পুলিশ। কিন্তু কারো কাছ থেকে কোন হদিস পায় নি ওরা।

তখন খানাতল্লাশির জন্য আয়োজন করছিল।

প্রথম গুলি ছুঁড়েছিলেন ডঃ সেনাপতি। সঙ্গে সঙ্গে সাজ্জাদ আক্রমণ চালিয়েছিলেন।

পাকা বাড়িটির ভিত পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল।

আধঘণ্টা দুপক্ষ সমানে লড়াই করেছিলেন। একদিকে অসমসাহসী মাত্র দুজন বিপ্লবী, অন্যদিকে চল্লিশ জন সশস্ত্র পুলিশ।

বিপ্লবীদের গুলি গোলা ফুরিয়ে যেতে বেশী দেরী হবার কথা নয়। মুহূর্তের জন্য বিরতি। সাজ্জাদের কানের কাছে মুখ এনে সেনাপতি বলেছিলেন, পালাতে হবে। কিছুতেই ধরা দেওয়া যাবে না।

কিন্তু—

তুমি ডানদিকের জানালার শিক ভেঙে পাইপ বেয়ে পাশের বাড়িতে লাফিয়ে পড়বে। সেখান থেকে খিড়কি পথ দিয়ে বড় রাস্তা। আমাদের গাড়ি সেখানে সবসময়ই মজুদ থাকে।

আর আপনি?

আমার জন্য ভাবনা নেই।

না, তা হয় না।

তুমি পালাও। ইতিমধ্যে আমি শেষ কয়টা গুলি দিয়ে ওদের সঙ্গে লড়াই করি!

না—

তীব্র চোখে তাকিয়ে বলেছিলেন ডঃ সেনাপতি, হুকুম তামিল করো!

বিপ্লব-কর্মের প্রধান শর্ত, রণক্ষেত্রে অধিনায়কের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। তার জন্য প্রাণ দিতে হলেও পশ্চাদপদ হওয়া যাবে না।

অনিচ্ছার সঙ্গে জানালার কাছে সরে গেলেন সাজ্জাদ।

সেই মুহূর্তেই আবার গুলিচালনা আরম্ভ করলেন ডঃ

সেনাপতি। কিন্তু আর্তনাদের শব্দে ফিরে তাকিয়ে দেখলেন মাটির কাছে পড়ে গেছেন সাজ্জাদ। তাঁর মাথায় গুলি।

একটা প্রচণ্ড বজ্রাঘাতের মতো মনে মনে আঘাত পেলেন সেনাপতি। সাজ্জাদ সাচ্চা বিপ্লবী। বীর এবং অকুতোভয়। মুহূর্তের জন্য চোখ বুজে সাজ্জাদের আত্মার কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন। ঠিক তখনই একটা গুলি এসে তাঁর হাত বিদ্ধ করল।

হাতে অসহ্য যন্ত্রণা। ফিরে তাকিয়ে দেখলেন মাথায় গুলির আঘাতে সাজ্জাদের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটেছে।

পাশের জানালা দিয়ে তিনি ঢুকে গেলেন মেয়েদের আস্তানার মধ্যে।

ওরা তখন কিছুটা বিহ্বল, কিছুটা আতংকিত। সেনাপতিকে দেখে দুজন মেয়ে ছুটে এলো। চীৎকার করে উঠল, বাবা!

এবাড়িতে মেয়েদের কাছে তিনি বাবা। সকলেই 'বাবা' বলে ডাকে। পিতার মতই শ্রদ্ধা ও মমতা ওদের।

ওরা তাড়াতাড়ি তাঁকে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়ে নিয়ে গেল একটা স্যাঁতসেঁতে জায়গায়। যেখানে চারদিকে ময়লা ছেঁড়া মালপত্র স্তূপীকৃত হয়ে আছে। একটা ঘুপচিতে তাড়াতাড়ি বিছানা করে তাঁকে শুইয়ে রেখে ওরা ত্রস্ত পায়ে চলে গেল।

ডঃ সেনাপতি আচ্ছন্নের মত পড়েছিলেন। বন্দুক ছোঁড়ার সময় কখন যে পায়ে চোট পেয়েছিলেন নিজেই বুঝতে পারেন নি।

এই নিরালায় পায়ে যন্ত্রণা বোধ হচ্ছিল।

পুলিসের হুইসেল ও খানাতল্লাশীর শব্দ শুনছিলেন।

এদিকটায় কারও পায়ের ধ্বনি শোনা গেল না।

সেদিনই গভীর রাত্রে দলের লোকরা তাঁকে সরিয়ে নিয়ে এসেছিল অন্য বাড়িতে।

সারা দেশ জুড়ে ওলন্দাজরা জঘন্য উৎপীড়ন সুরু করে দিয়েছিলেন। চারদিকে খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তার।

দোষী নির্দোষ বহু লোক বিনা বিচারে বন্দী হলেন। বন্দীদের মধ্যে ডঃ হুসেনও ছিলেন। তাঁর সোস্যালিস্ট দলকে সরকার বেআইনী ঘোষণা করেন।

গুপ্তচরদের শ্যেন চোখকে ফাঁকি দিয়ে রাত্রির অন্ধকারে বালিদ্বীপের বাড়িতে এসেছিলেন ডঃ সেনাপতি।

স্ত্রী ও শিশু কন্যার কাছ থেকে বিদায় নেবেন। এই ছিল বাসনা।

সেদিনের সেই আবেগবিহ্বল রাত্রিতে শিশু লখমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে ছিল। সারারাত্রি ধরে বৃষ্টি পড়ছিল, আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, ঝড়ের হাওয়া মাতোয়ারা হয়ে দাপাদাপি করছিল।

সেদিনের সে কাহিনী লখমি অনেকদিন পর শুনেছিল মায়ের কাছে। রুদ্ধগলায় মা বলেছিলেন, সে রাত্রি শেষ হবার আগেই তোর বাবা চলে গেলেন। তোর গালে চুমো খেয়ে আমাকে বলেছিলেন 'বিদায়'। তখনও আকাশে ঝড় থামে নি। তিনি চলে গিয়েছিলেন। ভাগ্যিস গিয়েছিলেন। নতুবা পরদিনই ধরা পড়তেন। সকালেই বাড়ি ঘেরাও করেছিল পুলিস।

মাকে ওরা বিন্দুবিসর্গ বুঝতে দেয়নি যে ওরা সর্বদা কড়া নজর রেখেছে এ বাড়ির উপর।

পাখি এসেছে ঠিক জানতে পেরেছিল, পাখি যে উড়েও গেল তা বুঝতে পারে নি।

পুলিস কোনদিনই ধরতে পারে নি ডঃ সেনাপতিকে। সমগ্র দেশটা, প্রতিটি দ্বীপ ওরা তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। কিন্তু কোথাও পায় নি।

তবে কি বাবা এখনও বেঁচে আছেন!

ভাবল লখমি। অবশ্য সে সম্ভাবনা নেই। কেননা দেশ এখন স্বাধীন। তাঁর স্বপ্ন এখন সফল। তাঁর আবির্ভাবের তো কোন বাধা নেই।

তিনি আর আসেন নি। হারিয়ে গেছেন ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্ত্তে।

চোখ মুদল লখমি। ভাবল এখন অনেক রাত হয়েছে। আর জেগে থাকলে কাল সকালে আর কাজে বেরোন সম্ভব নয়।

॥ দুই ॥

জুম্মাবার অফিস আদালত দোকান পাট সব ছুটি। সকাল বেলাই লখমি চলে এলো ডঃ হুসেনের বাড়িতে।

বাচ্চা চাকর সুলেমান দরজা খুলে দিয়েছিল। লখমিকে দেখে মিষ্টি হাসল, দিদি এতদিনে মনে পড়ল!

সুলেমানের পিঠে একটা গোঁত্তা মেরে হাসল লখমি। জিজ্ঞেস করল, সাহেব কোথায়?

চানের ঘরে।

তুই এই সুটকেসটা আমার ঘরে রেখে আয়। আমি রান্না ঘরটা ঘুরে যাচ্ছি।

বাল্যকাল থেকে এ-বাড়িতে মানুষ হয়েছে লখমি। এখানে একটা নির্দিষ্ট ঘর আছে, নিজের খাট, টেবিল, চেয়ার, আলমারি। আলমারিতে কিছু পোশাক পরিচ্ছদ মজুত আছে।

মৃদুকণ্ঠে একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে লখমি গিয়ে ঢুকল রান্নাঘরে।

সুলেমানের মা বুড়ি রোশনারার উপর বাড়ির রান্নাবান্নার দায়িত্ব।

বুড়ি পিঠে রোদ মেখে মুখ নিচু করে একটা মুরগীর খোসা ছাড়াচ্ছিল।

লখমি গিয়ে দুহাত দিয়ে ওর চোখ টিপে ধরল।

আঃ কি হচ্ছে? ছাড় বলছি।

কে বলো তো?

কে আবার, তুই সুলেমান। বললাম চট করে পেঁয়াজ রসুন নিয়ে আয়, তবু দেরী করছিস!

তোমার সুলেমানের হাত কি এমন নরম চাচী ?

অ্যাঁঃ তুই লখমি ?

এক ঝটকায় চোখের উপর থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বুড়ি রোশনারা হাসল। বলল, এবার থাকবি তো, নাকি আবার পালাবি ?

না। সাত দিনের ছুটি নিয়ে এসেছি। তোমাকেও এ সাত দিন ছুটি দেব। বাবার রান্নাবান্না আমিই করব।

ঘরের মেয়ে ঘরে এলো। এসে আবার রান্নাবান্না। সে হবে না বাপু, তা যাইই বলো। তুমি হাত মুখ ধুয়ে উপরে যাও, আমি এক্ষুনি চা নিয়ে আসছি।

বালিদ্বীপের নিজের বাড়ি কবে ছেড়ে এসেছে লখমি। এখানেই ছোটটি থেকে বড় হয়েছে।

ইস্কুল কলেজে পড়েছে। জাকার্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাচেলর্স ডিগ্রী নিয়েছে।

তারপর নিজেই বিভাগীয় বিপণিতে সেলস গার্লের চাকরি ঠিক করেছে। হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। হোস্টেলে যাওয়ার কথাটা যেদিন ডঃ হুসেনকে সে জানিয়েছিল, তিনি সারাদিন একটি কথাও বলেন নি। দীর্ঘশ্বাস ফেলেন নি, উচ্ছ্বাসও দেখান নি।

স্তম্ভিত মূক হয়ে গিয়েছিলেন।

শাহির তখন বাড়িতে থাকে। সারাদিন আড্ডা দিয়ে দুপুরে খেতে এসে যখন রোশনারার মুখে কথাটা শুনল, সেও আর ভাত খেতে পারে নি। সমুদ্র-মাছের রসাল চচ্চড়িটা টান মেরে ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছিল। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

সারা বাড়িতে একটা থমথমে আবহাওয়া।

অস্বস্তিতে কাটিয়েছিল লখমি।

কিন্তু সে তো নতুন যুগের মেয়ে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

ছাড়া নারীজাতির মুক্তি আসতে পারে না এ তত্ত্বে বিশ্বাসী। অথচ তার মনও শংকিত, বিষণ্ণ, মেঘ-ভারাক্রান্ত।

শাহির সন্ধ্যায় মুখ ফুটে স্পষ্ট বলেছিল, যাবিই যদি তাহলে দুদিনের জন্য জ্বালাতে এসেছিলি কেন?

ওমা, মিথ্যে কথা বলো না। একটুও জ্বালাই নি, তোমার প্যাণ্ট সার্ট কত ইস্ত্রি করে দিয়েছি, কত কিল চড় খেয়েছি তার ইয়ত্তা আছে।

ম্লানমুখে হেসেছিল লখমি। তারপর ডাঃ হুসেনের ঘরে গিয়ে একটা চেয়ারে নতমুখে বসেছিল।

কিছু বলবে মা?

আমার উপর আপনি রাগ করেছেন?

না তো।

তবে কারো সঙ্গে কথা বলছেন না তো।

শোনো মা লক্ষ্মীর কথা। তোমাদের উপর কি আমি রাগ করতে পারি? তোমরা সকলেই এখন বড় হয়েছ। জাহির মিলিটারির চাকরি নিয়ে ব্যারাকে চলে গেছে। শাহির তো দিন-রাত রাজনীতি নিয়ে টো টো করে বেড়ায়। তুমি চললে হোস্টেলে। তা ভাল। আমি বাধা দেব কেন?

না, বলছিলাম—

মৃদু গলায় বলেছিল লখমি।

যাবেই যদি, দু-তিন দিন পরে যেও। একটু প্রস্তুত হতে দাও। নইলে এমন আচমকা—

আচ্ছা।

ইজিচেয়ারে বসেছিলেন ডঃ হুসেন। সামনের চেয়ারে দুটো পা ছড়িয়ে রেখেছিলেন।

আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল লখমি।

কিন্তু সেবার যাওয়া হয় নি লখমির।

৩০শে নভেম্বর অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। সারা দেশে ক্রোধ ও ঘৃণার গর্জমান তরঙ্গ বয়ে গিয়েছিল।

প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণর জীবননাশের চেষ্টা করে ধরা পড়েছিল কয়েকটা ঘৃণিত মানুষ। একটু তদন্ত করতেই নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রটা আমূল ধরা পড়ে গিয়েছিল।

জাতির নায়ক সুকর্ণ। কোটি কোটি মানুষের নয়ন মণি। স্বাধীনতা ও বিপ্লবের প্রতীক। তাঁকে হত্যার চেষ্টাটা ধরা পড়ে যাওয়াতে সারা দেশে তুমুল আলোড়নের অন্ত ছিল না।

সে আলোড়নের ঢেউ এসে লেগেছিল ডঃ হুসেনের বাড়িতে। বাড়ির মনিব ভৃত্য সব কয়টি মানুষ উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছিলেন।

না ; এ অসম্ভব ঘটনা, অকল্পনীয়।

কয়েক বছর ধরেই দেশে একটার পর একটা আলোড়নের ঢেউ। বাং কর্ণ বলেন, আমাদের বিপ্লব অসমাপ্ত রয়েছে, বিপ্লবের আগুনকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। দেশে যত অনাচার, অত্যাচার, যত কলঙ্ক কালিমা সব বিপ্লবের আগুনে পুড়ে ছারখার করে দিতে হবে।

বিপ্লব !

জাগ্রত নব্য ইন্দোনেশিয়ার একমাত্র মন্ত্র, বিপ্লব !

বাং কর্ণ এই বিপ্লবের পুরোধা পুরোহিত।

সাড়ে তিন শ বছর ওলন্দাজ দস্যুরা শাসকের ভূমিকা নিয়ে দেশটাকে অবিরত শোষণ করেছে। সারা দেশের কোটি কোটি মানুষকে দিনের পর দিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর করে তুলেছে আর তার ফলে নিজেদের রাজকোষ স্ফীত থেকে স্ফীততর হয়েছে।

শুধু রাজকোষ নয়। নেদারল্যাণ্ডের প্রতিটি মানুষ এই লুণ্ঠনের শরিক হয়ে ব্যক্তিগতভাবে ধনী হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার নানা দ্বীপের মানুষরা আগে জাহাজের পাল তুলে বাণিজ্যে বেরিয়ে পড়ত।

তাদের হাত থেকে বাণিজ্যের অধিকার কেড়ে নিয়েছে ওলন্দাজরা।

দেশের খনিজ সম্পদ দখল করে কোটি কোটি টাকা ঘরে তুলে নিয়েছে।

ছোট্ট দেশ নেদারল্যাণ্ড, কিন্তু সেখানে সমৃদ্ধির অন্ত নেই। সারি সারি জমকাল প্রাসাদ, সুপ্রশস্ত বাঁধানো রাজপথ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, কলকারখানা—সারা দেশে সমৃদ্ধি আর সভ্যতার চমকলাগানো দীপ্তি।

সেই দীপ্তির নীচে পরাধীন ইন্দোনেশিয়ার স্তূপ স্তূপ অন্ধকার।

দেশের সেই অন্ধকারের দেওয়াল ভেঙে স্বাধীনতার আলোক বর্তিকা জ্বালিয়েছেন সুকর্ণ। রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে জনগণের যথার্থ মুক্তির কাজে লাগানোর জন্য সুকর্ণ বিপ্লবকে অব্যাহত রাখতে চাইছেন।

অগ্রগতির জন্য চাই বিপ্লব।

কিন্তু বিপ্লবের জন্য চাই সুকর্ণকে।

সুকর্ণ হত্যার চেষ্টা জাতির পক্ষে নিদারুণ লজ্জা, শোক ও কলঙ্কের ঘটনা।

ডঃ হুসেন এসে দাঁড়িয়েছিলেন ড্রইং রুমের পাশে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভেতরের কথাগুলি শোনবার চেষ্টা করছিলেন তিনি।

ঘরের ভেতর ছোট ছেলে শাহির বন্ধুদের সঙ্গে হত্যার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কথা বলছে।

ছোট ছেলেকে ঠিক বুঝতে পারেন না ডাঃ হুসেন। শাহির কমিউনিস্ট। কমিউনিস্টদের মধ্যেও তো আদর্শের পার্থক্যের জন্য দলাদলির অন্ত নেই।

শাহির জঙ্গিবাদী কমিউনিস্ট। ওর বন্ধুরাও তাই। এই কমিউনিস্টরা স্থকর্ণকে পছন্দ করে না, তাঁর মতাদর্শে বিশ্বাসীও নয়। অথচ পলিসির খাতিরে স্থকর্ণকে ওরা মদদ দিচ্ছে।

ডাঃ হুসেন নিজে মনেপ্রাণে সোসালিস্ট। আগে সোসালিস্টদের সঙ্গেই একজোট ছিল কমিউনিস্টরা। পরে ভেঙে ছুটো পার্টি হয়েছে।

বড় ছেলে জাহির ইসলামী শরিয়তে বিশ্বাসী। কোন পার্টির সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িত না হলেও, ডঃ হুসেন জানেন, জাহির মাসজুমি পার্টির সমর্থক।

জাহির বাড়িতে নেই। স্থমাত্রা দ্বীপের একটি মিলিটারি ঘাঁটির সে ক্যাপ্টেন। নতুন চাকরি, ভবিষ্যতে উন্নতির অনেক আশা।

শাহির চেঁচিয়ে বলছিল, আমাদের দেশে এখন একটা ক্রান্তি কাল চলছে। একালে পুরনো যুগ ভেঙেচুরে নতুন যুগের আবির্ভাব ঘটবে। সাধারণ মানুষ শিক্ষার অভাবে এবং সংস্কারের কাছে দাসত্বের ভলে এখনও রাজনৈতিক ভাবে সচেতন হয়ে উঠতে পারেন নি। সাধারণ মানুষকে যথার্থভাবে সচেতন করে তোলার জন্য প্রেসিডেণ্ট স্থকর্ণকে এখনও আমাদের দরকার। নতুবা মিলিটারী আর ইসলামী শরিয়তীবাদীরা দেশের সামান্য যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে সব ধ্বংস করে ফেলবে।

ডঃ হুসেন দরজার পাশ থেকে নিঃশব্দে সরে এলেন। তিনি নিজেও স্থকর্ণকে সমর্থন করেন না। তিনি মনে করেন প্রেসিডেণ্ট স্থকর্ণ পুরো ক্ষমতা নিজের করায়ত্ত রেখে একনায়কতন্ত্রের দিকে ঝুঁকছেন।

সমর্থন না করলেও দেশের এই বিপজ্জনক সময়ে স্থকর্ণের মত নেতার প্রয়োজন যে কতখানি তিনি তা জানেন।

সারা দেশে সেই তুমুল আলোড়নের বন্যায় ব্যক্তিগত কাজকর্মগুলি কিছুদিনের জন্য শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

লখমিও কয়েকদিনের মধ্যে হোটেলে যেতে পারে নি।

কিন্তু ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত সহ্যের সীমার মধ্যে চলে এসে আবার সবই গতানুগতিক পদ্ধতিতে চলতে লাগল।

একদিন ডঃ হুসেনের কাছে বিদায় নিয়ে লখমি চলে গিয়েছিল হোস্টেলে।

পিঠে কিল মেরেছিল শাহির।

জিভ বার করে মুখ ভেঙিয়েছিল লখমি।

ক্রমশঃ লখমির অনুপস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল এবাড়ি। কিন্তু ছুটি-ছাটা উপলক্ষ্যে লখমি যখনই বাড়িতে আসে, একটা উৎসবের ধুম পড়ে যায়।

বুড়ি রোশনারা হাসিমুখে রাজ্যের যত ভাল ভাল খাদ্য তৈরি করতে বসে। সুলেমান কারণে অকারণে ছোটাছুটি করে আর চেঁচায়।

ডঃ হুসেন নিজের ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে পায়চারি করেন। রোশনারাকে ডেকে খাবারের কথা জিজ্ঞেস করেন। সুলেমানকে অকারণে বখ্‌শিস দেন।

জুম্মা বারের ছুটির দিনে আজ অপ্রত্যাশিত ভাবে লখমিকে দেখে বুড়ি রোশনারা বলল, তোমার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করো; আমি চা নিয়ে যাচ্ছি।

বাবা কেমন আছেন বুড়িমা?

কিছুই তো বলেন না। তবে মনে হয় শরীরটা ভাল নেই। রাত্রিবেলা ভাল ঘুম হয় না।

হুঁ।

নিজের ঘরে এসে পোষাক বদল করল লখমি। রেশমি কোর্তা ছেড়ে আটপৌরে ঘরোয়া পোশাক পরল।

তারপর চুপিচুপি পায়ে এগিয়ে গেল ডঃ হুসেনের ঘরের দিকে। কিন্তু ভেতরে ঢুকল না। দাঁড়িয়ে গেল। ডাঃ হুসেন মৃদু গলায়

কথা বলছেন, সুলেমান জবাব দিচ্ছে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনল লখমি।

—দিদিকে বেশ হাসিখুশি দেখলি তো?

—হ্যাঁ। মার সঙ্গে রান্নাঘরে বসে গল্প করছে।

—তুই যেন কি একটা বই চাইছিলি?

—জাতকের কাহিনী। খুব মজার গল্পের বই। দিদিকে বলে দেব, নিয়ে আসবে।

—আচ্ছা, মানিব্যাগটা বালিশের নীচে থেকে নিয়ে আয়। ওটা না, মাথার বালিশ। হ্যাঁ। নিয়ে আয়। কত চাস?

—না আমি চাই না কিছু।

—নে, দুটো টাকা নিয়ে যা। আর দেখ তো, দিদি কি করছে। কিচ্ছু বলিস না, আমার কাছে চুপিচুপি বলে যাবি।

তৎক্ষণাৎ ভেতরে ঢুকল লখমি।

হাসলেন ডঃ হুসেন। বললেন, এতদিনে বুড়ো ছেলেকে মনে পড়ল মা?

ডঃ হুসেনের মাথার চুলে আস্তে আস্তে আঙ্গুল বোলাতে বোলাতে বলল লখমি, কেমন আছেন বাবা?

ভাল। কিন্তু তোমাকে তো একটু কাহিল কাহিল দেখছি মা। ভাল করে খাওয়া-দাওয়া কর তো? না খালি টাকা রোজগারের জন্য পরিশ্রম করে বেড়াও।

ভারি তো পরিশ্রম। কিন্তু আপনার নাকি রাতে ভাল ঘুম হয় না? ঠিক নাকি বাবা?

বুড়ো হয়েছি তো, এ বয়সে ঘুম একটু কমে যাবেই।

বুড়ো না ছাই! আপনার থেকে বয়সে তিন-চার বছরের ছোট প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ তো এখনো যুবক!

সুকর্ণ চিরকালই এরকম। অনেকদিন তো দেখে আসছি। ব্লাড প্রেসারের জন্যই আমি তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে গেলাম।

এখন কত প্রেসার ?

অনেকদিন মাপাই নি।

আজই আমি ডাক্তারকে ডাকব। প্রেসার মাপতে হবে। ওষুধ-গুলো ঠিকমত খেতে হবে। তাহলে শরীরের এত অস্বস্তি থাকবে না।

সন্ধ্যায় ডাক্তার এলেন। প্রেসারটা বেড়েছে। ওষুধ লিখে দিয়ে সাবধানে থাকার জন্য নির্দেশ দিলেন। কোন রকম উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা যেন না করতে হয়।

কিন্তু উদ্বেগ-থেকে রক্ষা পাওয়ার সাধ্য কোথায় ?

সেদিনই রাত্রের রেডিওতে খবর শোনা গেল, মধ্য সুমাত্রায় কিছু মিলিটারী সেনাপতি বিদ্রোহ করেছে। তবে অবস্থা আয়ত্তের বহির্ভূত নয়। প্রজাতন্ত্রী সৈন্যবাহিনী অবিলম্বে বিমান যোগে যাত্রা করেছে বিদ্রোহ দমন করার জন্য।

মিলিটারীদের বিদ্রোহ ?

কথাটা বিদ্যুতের মত চমকে দিল ডঃ হুসেন আর লখমিকে।

লখমির মনে পড়ল জাহিরের কথাগুলি। ব্রিগেডিয়ার জাহির এখন মধ্য সুমাত্রায় নিযুক্ত।

ডঃ হুসেন কিছু বললেন না। তিনি জানেন, রেডিও বার্তায় বিদ্রোহের কথাটা ঘোষণা করার অর্থ বিদ্রোহটা কঠোর আকার ধারণ করেছে। অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ।

তাঁর দুই ছেলেই এখন সুমাত্রায়।

বড় ছেলে জাহির মিলিটারী সেনাপতি।

ছোট ছেলে শাহির কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সুমাত্রার প্রান্তীয় শহরে অনুষ্ঠিত যুব সম্মেলনের আমন্ত্রিত সভাপতি।

অনেকক্ষণ পর তিনি শুধু বললেন, আল্লা, মাতৃভূমি ইন্দোনেশিয়াকে তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ কে জানে!

লখমির চোখে জলের আভাস। তা লুকোবার জন্যই সে তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল।

॥ তিন ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের কাছে রণনৈতিক ও কূটনৈতিক পরাজয়ের পর ওলন্দাজ ঔপনেবেশিক শক্তি দেশের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে।

কিন্তু দেশে একটার একটা পর সংঘাত। সংঘাতে সংঘাতে সমস্যা জটিল। সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়ে এক জাতি এক প্রাণ একত্বা নিয়ে দেশের সমৃদ্ধির পথ তৈরি করার উদ্দীপনা পাওয়া যাচ্ছে না।

ইন্দোনেশিয়ার বর্তমানকে বুঝতে হলে অতীতকেও জানতে হবে। অতীতের ঐতিহ্য থেকেই বর্তমানের ধারা পুষ্ট।

ভারতের সঙ্গে প্রাচীন ইন্দোনেশিয়ার যোগসূত্র শুধু আত্মীয়তার নয় আত্মার।

সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পাঁচ শ বছর আগেও ছিল হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির পীঠভূমি।

মূল ভারতে হিন্দু রাজত্বের অনেক পরেও এখানে ছিলেন হিন্দু রাজা। ছিল হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজত্ব।

ইন্দোচীন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপমালাকে ভারতবাসীরা 'সুবর্ণভূমি' নামে অভিহিত করতেন।

অতীতকালে ভারতীয় সদাগর, ধর্মপ্রচারক ও পরিব্রাজকরা ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে জলপথে এই সমস্ত দেশে পরিভ্রমণ করে এখানে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্ম ছড়িয়ে দিয়েছিল। জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপের মশলাদ্রব্যাদি জগদ্বিখ্যাত। এগুলির জন্যই ভারতীয় সদাগরদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। পরে এই দ্রব্যগুলিই আকর্ষণ করে টেনে এনেছিল য়ুরোপীয় বণিকদের।

ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম এবং পরে বৌদ্ধ প্রচারকদের উৎসাহে এই সমগ্র সুবর্ণভূমিতে এক সমৃদ্ধ ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠে।

অসংখ্য ভারতীয় সেখানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। স্থানীয় অধিবাসীদের হিন্দু এবং পরে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন। স্থানীয় নারীদের সঙ্গে অবাধে তাঁদের বিবাহ হত। ফলে তাঁরা এতদ্দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। হিন্দু ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতা সমগ্র সুবর্ণভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতীয় হিন্দুরাও স্থানীয় লোকদের রীতিনীতি ও ভাষা গ্রহণ করেছিল। ভারতীয় ও স্থানীয় লোকদের সংমিশ্রণের ফলে এখানকার সমস্ত অধিবাসীই কালক্রমে হিন্দু নাম, হিন্দু ধর্ম ও নিয়ম প্রথার প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছিল।

দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে মালয় উপদ্বীপ, কম্বোডিয়া, শ্যাম, জাভা ও সুমাত্রায় অনেকগুলি হিন্দু রাজ্য গড়ে উঠে। এই রাজ্যগুলির বিবরণ সংস্কৃত তাম্রশাসন ও বৈদেশিকদের ভ্রমণবৃত্তান্তে পাওয়া যায়।

ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রসারের ফলে এই বিস্তীর্ণ এলাকার লোকেরা প্রায় হাজার বছর ধরে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাবে গড়ে উঠেছিল।

ইন্দোচীনে চম্পা ও কম্বোজ নামে দুটি শক্তিশালী হিন্দু রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। চম্পা রাজারা ছিলেন পরাক্রমশালী, ধর্মপরায়ণ ও বিদ্যানুরাগী। কুবলাই খানের আক্রমণ তাঁরা প্রতিহত করেছিলেন।

কম্বোজ সম্বন্ধে একজন চৈনিক পরিব্রাজক লিখেছেন: "ভারতবর্ষ থেকে এক হাজারের বেশী ব্রাহ্মণ এখানে এসে বাস করছেন। দেশের লোকরা তাঁদের ধর্ম অনুসরণ করে আর তাঁদের সঙ্গে নিজেদের মেয়ের বিয়ে দেয়। এই পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ দিনরাত তাঁদের শাস্ত্র গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন।"

কম্বোজ রাজ্যেই পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য মন্দির 'আঙ্কোর ভোট বিষ্ণু মন্দির' নির্মাণ করা হয়েছিল। এই বিরাট মন্দিরটি নানা স্তরে বিভক্ত। প্রাচীর গাত্রে খোদিত রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী একটি অপূর্ব শিল্প নিদর্শন। এই মন্দিরে আটটি গগনস্পর্শী চূড়া আছে।

সমগ্র হিন্দু জগতে এমন বিরাট এবং অপূর্ব মন্দির আর দ্বিতীয়টি নেই।

ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রাচীন কালে 'শ্রীবিজয়' নামে এক শক্তিশালী হিন্দুরাজ্য গঠিত হয়েছিল।

এই রাজ্য সম্ভবত চতুর্থ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সপ্তম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই রাজ্যের নৌ-শক্তি ছিল অত্যন্ত পরাক্রান্ত। রণ এবং বাণিজ্য অর্ণবগুলি ইন্দোনেশিয়ার সীমা ছেড়ে ভারত ও চীনে আনাগোনা করত।

অষ্টম শতাব্দীতে মধ্য-জাভায় মহারাজা সঞ্জয়ের অধীনে মাতরম রাজ্য গঠিত হয়। এঁরা ছিলেন শৈবতন্ত্রের উপাসক। অনেকগুলি শিবমন্দির তৈরি হয়েছিল এখানে। এখনও তার নিদর্শন রয়েছে।

তারপর শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটে। প্রায় সমগ্র ইন্দোনেশিয়া এবং মালয় উপদ্বীপ এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সম্রাটগণ ছিলেন ধর্মে বৌদ্ধ।

শৈলেন্দ্র-যুগে ইন্দোনেশিয়ার শাসন শৃঙ্খলায় ঐক্য গড়ে উঠে। নানা ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত সারা দেশটা একই সাম্রাজ্যের অধীন হওয়ায় একই সংস্কৃতির আওতার মধ্যে আসে। সম্ভবত তখনই নিখিল ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবোধের সূত্রপাত হয়।

শৈলেন্দ্র সম্রাটগণ ছিলেন মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। ৭৮২ খৃষ্টাব্দে কুমারঘোষ নামে একজন বাঙালী বৌদ্ধ শৈলেন্দ্র রাজগণের কুলগুরু ছিলেন।

শৈলেন্দ্র রাজবংশের অস্তাচলের সময় মধ্য জাভায় মজাপহিৎ

সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। এঁরাও ছিলেন বৌদ্ধ। কিন্তু বালি দ্বীপে প্রাচীন কাল থেকে এখন পর্যন্ত হিন্দু ধর্ম অব্যাহত ভাবে চলে আসছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মজাপহিৎ সাম্রাজ্যের পতন দেখা দেয়। তখন থেকে ক্রমশঃ জাভা সুমাত্রা ও অন্যান্য দ্বীপের রাজা ও প্রজাসাধারণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে মালয় উপদ্বীপে যে সব সাম্রাজ্য গড়ে উঠে, তার মধ্যে মলাক্কা রাজ্য ছিল সব থেকে শক্তিশালী।

আগে মলাক্কা ছিল সামান্য একটি জেলেদের গ্রাম। একদিন সে গ্রামে একটি নতুন তরুণের মুখ দেখা গিয়েছিল। বড় বিষণ্ণ সে মুখ।

কি নাম গো তোমার?

নাম? নাম দিয়ে কি হবে? আমার কোন নাম নেই। করুণ কণ্ঠে বলেছিল যুবকটি।

জেলেরা হেসেছিল। বলেছিল, নাম ছাড়া কি কোন মানুষ হয় গো? তুমি দেখছি হাসালে!

সেই যুবকটির নাম ছিল পরমেশ্বর। সাধারণ পরিবারের মানুষ নয়, মজাপহিৎ রাজবংশের রাজপুত্র।

অত্যন্ত চঞ্চল ও দুর্দান্ত ছিল রাজপুত্র পরমেশ্বর। নানা অপকর্মের নায়ক। প্রজাদের উপর নিষ্ঠুর পীড়ন ও অকথ্য অত্যাচার ছিল তার বিলাস। আর ছিল অমিতাচারী।

রাজা ওকে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছিলেন। রাজ্যের সীমা থেকে তাকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল।

জাভা থেকে বিতাড়িত হয়ে পরমেশ্বর মালয় উপদ্বীপের নানা অঞ্চলে ঘুরেছিল। কোথায়ও মন টেঁকে নি।

কিন্তু মলাক্কা গ্রাম তাকে আকর্ষণ করল। গ্রামের মানুষগুলো সরল অথচ কর্মপটু। সাগরে নৌকো ভাসিয়ে মাছ ধরে। জল ঝড়ে নির্ভয়। তীর ধনুক ও বর্শা ছোঁড়ায়ও অব্যর্থলক্ষ্য।

পরমেশ্বরের মনে একটা সংকল্প জেগে উঠেছিল।

প্রতিশোধ নিতে হবে।

এই জেলেদের নিয়ে একটি সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলবে। যুদ্ধ চাই। রাজ্য চাই। রাজক্ষমতা চাই।

তার মাথায় তখন একটি মাত্র চিন্তা—প্রতিহিংসা!

প্রথমেই সে ধর্ম পরিবর্তন করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হল। নাম বদল করল, পরিচয় বদল করল, নিজেকে রূপায়িত করল এক পরিবর্তিত ব্যক্তিত্বে।

পরমেশ্বর হয়ে উঠলেন সেকেন্দর শা।

সৈন্যদল গঠন করে তিনি মলাক্কা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চল নিয়ে একটি ছোট-খাটো রাজ্যের পত্তন করেন। মুসলমান আরব ব্যবসায়ীদের তিনি বিশেষ সমাদর করতেন।

দুর্দান্ত অত্যাচারী রাজপুত্র ইতিহাসে বিখ্যাত হলেন বিচক্ষণ সুলতান হিসাবে।

তিনি সারাজীবনের চেষ্টায় মলাক্কাকে একটি শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলেন। বাণিজ্যের একটি সফল কেন্দ্র হয়ে উঠে মলাক্কা।

আর ইসলাম ধর্ম সম্প্রসারণের কেন্দ্র।

ইরাণ এবং গুজরাট থেকে অনেক মুসলমান বণিক মলাক্কায় বসবাস স্থাপন করেন।

মলাক্কা কেন্দ্র থেকে ইসলাম ধর্ম শুধু মালয় নয়; জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও ও ইন্দোনেশিয়ার নানা দ্বীপে ইসলাম ধর্ম বিস্তার লাভ করে।

মলাক্কার ঐশ্বর্য ও বাণিজ্যিক প্রতিপত্তিই সুবর্ণভূমিতে ইসলাম অভিযানের সাফল্যের অন্যতম কারণ।

কিছুকালের মধ্যে মজাপহিৎ রাজত্বেরও অবসান ঘটল।

ইন্দোনেশিয়ার জনসাধারণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এবং অঞ্চলে অঞ্চলে ধর্মবিশ্বাসের তারতম্য রয়ে গেছে।

সেকালেও ছিল।

এমন কি, পাঁচ শ বছর পরে এখনও এই তারতম্য বর্তমান।

অনেক মানুষ ইসলাম ধর্মের সমগ্র রীতিনীতি ও বিশ্বাস মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা নিয়মিত মসজিদে নামাজ পড়েন, রমজান মাসে রোজা পালন করেন।

আবার অনেক মানুষ নিজেদের মুসলমান বলে অভিহিত করলেও প্রাচীন সংস্কার এবং বিশ্বাস ছাড়তে পারেন নি। এই সংস্কার ও বিশ্বাস অনেকটা হিন্দু ও বৌদ্ধ অনুশাসনের সঙ্গে স্থানীয় নানা কাহিনীর সংমিশ্রণ।

অন্যান্য স্থানে তো বটেই, এমনকি মূল জাভাতেও তা স্পষ্ট চোখে পড়ে।

গোঁড়া মুসলমান যেমন দেখা যায় তেমনি চোখে পড়ে নামে মাত্র মুসলমানের।

ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম ধর্মের প্রসার কয়েক বছরের মধ্যে ঘটে নি। কালে কালে এবং ক্রমাগত ভাবে চলেছিল।

এখন সারা দেশে হাজার হাজার মসজিদ, প্রত্যহ পাঁচ হক্ত নামাজ পড়া হয়, সারা দেশে চলে রোজা পালন। ধর্মীয় মানুষরা মক্কায় যান তীর্থযাত্রায়, ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি অনুসারে সামাজিক আচার অনুষ্ঠান পালিত হয়।

ইন্দোনেশিয়া এখন পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম মুসলমান রাজ্য। এখানে প্রায় দশকোটি মানুষের বাস।

মলাক্কা প্রত্যক্ষ কেন্দ্র হলেও ভারতবর্ষ থেকেই এখানে ইসলাম ধর্মের আমদানী হয়। আগে যেমন হয়েছিল হিন্দু ধর্মের এবং পরে বৌদ্ধ ধর্মের। তেমনি সর্বশেষ আমদানী ইসলাম ধর্মের।

কিন্তু মলাক্কায় মুসলমান সুলতানের প্রাধান্য বেশীদিন বজায় থাকে নি। দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান, মশলা দ্রব্যাদির লোভে য়ুরোপীয় বণিক ও দস্যুদের এখানে ভিড় জমে উঠে।

পর্তুগীজ সেনাপতি আলবুকার্ক ১৫১১ খৃষ্টাব্দে মলাক্কা অধিকার করে নেয়। লিসবন হয়ে ওঠে পৃথিবীর বাণিজ্য রাজধানী।

কিন্তু ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও স্পেনীয় জলদস্যুদের উৎপাত আরো বেড়ে ওঠে। বাণিজ্যের অধিকার নিয়ে তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। যুদ্ধ বিগ্রহের অন্ত থাকে না।

ক্রমশ এ অঞ্চলে ইংরেজ ও ওলন্দাজরা পর্তুগীজদের প্রবল প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

পর্তুগীজদের অধিকৃত স্থানগুলি ইংরেজ ও ওলন্দাজরা গ্রাস করতে আরম্ভ করে। কালক্রমে তাঁরা পর্তুগীজদের এখান থেকে হটিয়ে দেয়।

তখন থেকে এ-তুই শক্তিই এখানকার আধিপত্য নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।

ইংরেজদের মত ওলন্দাজরাও গঠন করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি। এই কম্পানি ক্রমশ জোরদার হয়ে ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে মলাক্কা অধিকার করে।

ওলন্দাজদের হাতে পরাজিত হয়ে ইংরেজরা ভারতবর্ষ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। ফরাসীরা অধিকার করে ইন্দোচীন। আর ওলন্দাজরা গড়ে তোলে ইন্দোনেশিয়ায় এক বিরাট ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য।

ধনধান্যে সুজলা সুফলা, মহার্ঘ্য মশলাদ্রব্যে অতিশয় মূল্যবান এবং বিরাট খনিজ সম্পদে লক্ষ্মীবন্ত এই দেশ ওলন্দাজরা শতাব্দীর পর শতাব্দী লুণ্ঠন করতে থাকে।

দেশীয় রাজা ও সুলতানদের উপর নিত্যনৈমিত্তিক শাসনভার ছেড়ে দিয়ে ওলন্দাজ বণিকরা এই দেশের সম্পদ লুঠ করতে থাকে। ক্রমশ দেশীয় সুলতানদের উপর অসহ্য আর্থিক চাপ দিয়ে সুলতানদের ক্ষমতা কেড়ে নেয়।

বাণিজ্যে সমৃদ্ধ একটি শক্তিশালী দেশ ওলন্দাজদের লুঠের চাপে পড়ে ক্রমশ হীনবল হয়ে পড়ে।

দেশীয় মানুষরা ক্ষুধিত কৃষক ও খনির মজুরে পরিণত হয়।

ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির নিষ্ঠুর পীড়নের সংবাদ যখন হল্যাণ্ডে প্রচারিত হতে থাকে, তখন সেখানকার ভদ্রলোকেরা লজ্জায় অধোবদন হয়ে যায়।

বণিকদের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ওলন্দাজ রাজকীয় সরকার ইন্দোনেশিয়া প্রত্যক্ষভাবে শাসন করতে আরম্ভ করে।

কিন্তু দেশের লোকদের উপর অমানুষিক অত্যাচার তাতে সামান্যই হ্রাস পেয়েছিল।

সাম্রাজ্যের স্বাদে য়ুরোপীয়রা তখন শ্বাপদের মত হিংস্র। বিশাল জনসমুদ্র এবং বিরাট ভূমিসম্পদ তাদের কাছে নিছকই লুঠতরাজের আধার মাত্র।

ওলন্দাজ শাসনের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার বুদ্ধিজীবী মহলে প্রথম বিদ্রোহের ভাব সঞ্চারিত হয়েছিল বিংশশতাব্দীর প্রথম দিকে। কয়েক দশকের মধ্যে বিদ্রোহের চেতনা বিপ্লবের আদর্শে উদ্দীপিত হয়ে উঠে।

ডঃ সেনাপতি সেই বিপ্লবের শহীদ।

তেমনি আরো শহীদ ছড়িয়ে আছেন সারা দেশে। কিন্তু সে বিপ্লব অসমাপ্ত। অ-সাফল্যযুক্ত।

সেই বিপ্লবই অব্যাহত রাখতে চান স্বাধীনতার সূর্য প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ।

সুকর্ণ ইন্দোনেশিয়ায় স্বাধীনতার জনক।

॥ চার ॥

প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ।

১৯০১ সালে সুরবাজা বন্দর থেকে ৬০ মাইল দূরে একটি গণ্ডগ্রামে তাঁর জন্ম। বাবার নাম সুকেমি, মা জোমানরাই।

বাবা জাভার মুসলমান।

মা বালিদ্বীপের হিন্দু।

বাবার কাছ থেকে সুকর্ণ পেয়েছিলেন ইসলাম ধর্মবিশ্বাস আর তীব্র জাতীয়তাবোধ।

মার কাছ থেকে পেয়েছিলেন রামায়ণ মহাভারতের শিক্ষা। দুই মিলে সুকর্ণর মানসচেতনায় বাল্যকাল থেকেই গড়ে উঠেছিল বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয়ের অনুভূতি।

বাল্যকালে দুর্দান্ত ছিলেন সুকর্ণ। দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান ছিল তাঁর বাঁধা, আবার স্কুলের পরীক্ষায়ও ছিলেন অদ্বিতীয় স্থানের ক্রমাগত অধিকারী।

চোদ্দ বছর বয়সে সুকর্ণ সুরবাজায় এক ধনী ব্যবসায়ীর বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতে এলেন।

এই ব্যবসায়ীর নাম জোক্রোয়ামিনোতো। তিনি ছিলেন অগ্রণী জাতীয়তাবাদী এবং বিখ্যাত লেখক। ইসলাম ধর্মবিশ্বাস, কার্ল মার্কস এবং জর্জ বার্ণার্ড শ এর শিক্ষার প্রভাবে তাঁর রাজনৈতিক নীতি গড়ে উঠেছিল।

এই বাড়িতে নিয়মিত রাজনীতির আড্ডা বসতো। বিপ্লবী, জাতীয়তাবাদী, এমন কি ইসলাম শরীয়তীবাদীরাও আসতেন। কিছুদিনের মধ্যে সুকর্ণ এখানে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেন। জোক্রোয়ামিনোতো তাঁকে সক্রিয় রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করেন।

তেজস্বী বক্তৃতা রপ্ত করতে শেখান, জাতীয়তাবাদের শিক্ষায় প্রভাবিত করেন। তাঁর কন্যা সতী উতরির সঙ্গে সুকর্ণের বিবাহ দেন। সতী সুকর্ণের প্রথমা স্ত্রী।

উনিশ বছর বয়সে সুকর্ণ ওলন্দাজদের নবনির্মিত টেকনিক্যাল কলেজে ভর্তি হল। সিভিল এঞ্জিনিয়ার হিসাবে তিনি ডিগ্রীলাভ করেন।

অধ্যাপকরা সুকর্ণ সম্পর্কে বলতেন, "দি মোস্ট প্রমিজিং স্টুডেন্ট উই এভার হ্যাড।"

ভাল চাকরির আমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাখ্যান করে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন।

এই সময়ই ডঃ মহম্মদ হাতার সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব গড়ে উঠে।

ডঃ হাতা জাকার্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করে হল্যাণ্ড যান উচ্চ শিক্ষার জন্য। সেখানকার আমস্টার্ডম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

ডঃ হাতা'র সঙ্গে নিবিড় ও আজীবন বন্ধুত্ব স্থাপিত হলেও রাজনীতির সকল বিষয়ে দুজনের মিল হত না।

ডঃ হাতাকে ওলন্দাজ সরকার গ্রেপ্তার করে বন্দী করে রাখেন। প্রতিবাদে সুকর্ণ তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করে দেন।

এই সময়ই তিনি বান্দুং শহরে 'পার্তাই ন্যাশন্যাল ইন্দোনেশিয়া' অর্থাৎ ন্যাশন্যালিস্ট পার্টি অব ইন্দোনেশিয়া (পি. এন. আই) স্থাপন করেন।

এই রাজনৈতিক সংগঠনে বিভিন্ন বিপ্লবী উপদল সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে। ক্রমশ এই দল সারা দেশে এক অভূতপূর্ব স্বাধীনতার উদ্দীপনা ছড়িয়ে দেয়। সুকর্ণ হয়ে ওঠেন এই দলের অবিসংবাদিত নেতা।

ওলন্দাজ সরকার সুকর্ণকে গ্রেপ্তার করতে কালবিলম্ব করে নি।

চার মাস ধরে বিচারের প্রহসন করে তাঁকে চার বছরের জন্য জেলে পুরে রাখে।

আদালতে সুকর্ণের জবানবন্দী দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক মূল্যবান দলিল। তিনি ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীর শাসনকে শয়তানের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, এই অপ-শাসন ধ্বংস করার জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করতে হবে।

স্বাধীনতা জনসাধারণের জন্মগত অধিকার!

চার বছর পর তিনি মুক্তিলাভ করেন। জেল গেটে হাজার হাজার মানুষ ফুলের মালা নিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জানান।

তিনি তেজোদৃপ্ত বক্তৃতায় বলেন, "আত্মোৎসর্গের জন্য আমি মাত্র দশজন কৃতসংকল্প স্বেচ্ছাসেবক চাই। এই দশজন শহীদ সাম্রাজ্যবাদকে চিরকালের জন্য খতম করে দেবে।"

দশজনের জায়গায় হাজার মানুষ নিজের প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য এগিয়ে এলেন।

কিন্তু ওলন্দাজ সরকার কিছুমাত্র অপেক্ষা করে নি। তৎক্ষণাৎ তাঁকে বাইরে দ্বীপে নির্বাসিত করে।

এখানে কয়েক শ রাজনৈতিক বন্দীকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

বন্দীত্বের দিনগুলি ছিল তাঁর নিরন্তর অধ্যয়ন, চিন্তা ও আলোচনার। বিভিন্ন মতাবলম্বী বন্দীদের সঙ্গে তিনি মুক্তির পথ এবং স্বাধীনতার পরবর্তী জাতীয় সংগঠনের বিষয় নিয়ে গভীর আলোচনা করতেন।

আর ছিল ব্যক্তিগত পাঠচর্চা। ইংরেজি, ফরাসী ও ইন্দোনেশীয় ভাষায় নানাধরনের বই পড়তেন। আর পড়তেন লেনিন, টমাস জেফারসন, গান্ধী, জন ডিউই, আব্রাহিম লিঙ্কন এবং বার্ণার্ড শ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্য-পর্ব পর্যন্ত এভাবেই চলছিল।

জাপান অক্ষশক্তির সঙ্গে যোগদান করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অগ্রসর হওয়ার সময় কয়েকদিনের মধ্যেই জাভায় অবতরণ করে।

ওলন্দাজ শক্তি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে কিন্তু প্রবল আক্রমণের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং বিদেশী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি ওলন্দাজ নাগরিককে জাপানীরা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী করে রাখে।

দেশীয় মানুষদের উপর শাসন ভার অর্পিত হয়। সুকর্ণ ও ডঃ হাতা বন্দীশালা থেকে মুক্তিলাভ করে সারা দেশে এক অভূতপূর্ব আন্দোলন আরম্ভ করেন।

হিরোশিমা ধ্বংস কাণ্ডের পর জাপানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের পর জাতীয়তাবাদী মুক্তিসংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠে।

সুকর্ণ স্বাধীনতা প্রজাতন্ত্রী ইন্দোনেশীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সরকারের ভিত্তি ছিল সমগ্র জাতির উপর।

প্রেসিডেন্ট : সুকর্ণ।

ভাইস-প্রেসিডেন্ট : ডঃ মহম্মদ হাতা।

প্রধান মন্ত্রী : জাহীর।

জাপানীদের অস্ত্রশস্ত্র এই সরকার লাভ করেন। সামরিক বলে বলীয়ান একটি সুসংগঠিত সৈন্যবাহিনী গড়ে উঠে।

ছয় সপ্তাহ পর ইংরেজ শক্তি জাভাতে অবতরণ করে ওলন্দাজদের মুক্তি দেয়।

কিন্তু ওলন্দাজরা আর পাকাপাকিভাবে কোনদিনই শাসনক্ষমতা ফিরে পায় নি।

ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে প্রজাতন্ত্রী সৈন্যদলের সর্বত্র সংঘর্ষ চলতে থাকে।

ওলন্দাজরা আবেদন জানানঃ আগে আমাদিগকে শাসন-ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হতে দিন। তারপর আপনাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বসা যাবে।

সুকর্ণের সাফ জবাবঃ সে আশা ছাড়, এই মুহূর্তে এই দেশ থেকে দূর হয়ে যাও।

ওলন্দাজরা পুলিসী ব্যবস্থা গ্রহণের পথ নেয়। কিন্তু প্রজাতন্ত্রী সৈন্যদল ও অঞ্চলে অঞ্চলে গেরিলা বাহিনী ওলন্দাজদের পর্যুদস্ত করতে থাকে।

রাষ্ট্রসংঘেও ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জমা হতে আরম্ভ করে।

অবশেষে ওলন্দাজরা প্রজাতন্ত্রী সরকারের সঙ্গে অলোচনায় বসতে বাধ্য হয়।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজরা প্রজাতন্ত্রী সরকারের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়ে স্বদেশে প্রস্থান করে। কিন্তু ওলন্দাজ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি তখনও দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল।

জনগণের প্রথম অধিকার স্বাধীনতা লাভ হলো, কিন্তু জাতি গঠনের কাজ ত্বরান্বিত করা গেল না।

নানা স্বার্থের সংঘাতে দেশে চলল একটানা উত্তেজনা।

ক্যাপ্টেন ওয়েস্টারনিং নামে এক ওলন্দাজ দুঃসাহসী কিছু য়ুরোপীয় সৈন্যদল সংগ্রহ করে প্রজাতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে দিল।

ইসলামী শরীয়তের অনুশাসন মত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আদর্শে উদ্বুদ্ধ দারুণ ইসলাম দলের কিছু উন্মত্ত জনতা বান্দুং এর দক্ষিণ পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

দক্ষিণ মলুক্কাসে একটি পৃথক প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠনের দাবী ঘোষণা করা হল।

এম্বোনিজ অঞ্চলের মানুষরা যুগে যুগে ওলন্দাজ সৈন্যবাহিনীতে কাজ করেছে; প্রভুদের বিদায়ে কুপিত প্রাক্তন সৈন্যরা প্রজাতন্ত্রী সরকারের অধীনতা অস্বীকার করল।

উত্তর সুমাত্রার আতজে অঞ্চলের লোকেরা ছিল সবকিছুর বিরুদ্ধবাদী; এরা অবিলম্বে স্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

উত্তেজনার পর উত্তেজনা।

সংঘাতের পর সংঘাত।

বিদেশীদের বিতাড়িত করে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠিত হলেও দরিদ্র, দুঃস্থ, অশিক্ষিত দেশকে সুসমৃদ্ধ করে গঠন করার পথে অন্তরায় দেখা দিল অনেক।

দেশে মতান্তরের অন্ত রইল না।

অনেকগুলি রাজনৈতিক পার্টি গজিয়ে উঠল, নানান ধরনের আদর্শ দেখা দিল।

১৯৫৫ সালের প্রথম নির্বাচনে ২৮টি রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

চারটি বড় দল অধিকাংশ আসন অধিকার করে নেয়। জাতীয়তাবাদী পি. এন. আই লাভ করে ৫৭টি, মুসলিম মাসজুমি পার্টিও পায় ৫৭টি, মুসলমান মৌলভীদের নেতৃত্বে চালিত নাহদাতুল উলামা দল পায় ৪৫টি এবং কমিউনিস্ট দল পি. কে. আই পায় ৩৯টি আসন।

সোসালিস্ট পার্টি নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। অন্যান্য দলগুলিও ব্যর্থ হয়।

সুকর্ণ জাতীয় একতায় বিশ্বাসী। তিনি বৃহৎ চারটি দল নিয়ে সরকার গঠন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কমিউনিস্টদের সঙ্গে কেউ কাজ করতে সম্মত হয় নি।

বাকি তিনটি দল নিয়ে সরকার গঠিত হল।

কিন্তু জনগণের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত হল না। আঞ্চলিক

স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের দাবী দিয়ে নানা শহরে তরুণদের বিক্ষোভ প্রচণ্ড আকার ধারণ করল।

কয়েক জায়গায় বাধল পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ।

প্রতিবাদে মাসজুমি পার্টি সরকার থেকে পদত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন।

দিনের পর দিন একটানা উত্তেজনা।

মধ্য সুমাত্রায় সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহ দেশের সামনে আরেকটি প্রতিবন্ধক।

একের পর এক এইভাবে চলতে থাকলে জাতিগঠনের কাজ যে বন্ধ হতে থাকবে। জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জিত না হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে অর্থহীন।

ডঃ হুসেন ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বারান্দায় এসে একটুখানি পায়চারী করলেন।

লখমির ঘরে বাতি জ্বলছে।

সুলেমান কি করছে?

শাহির কবে আসবে?

জাহির কি বিদ্রোহের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে?

নানা প্রশ্ন তাঁর মনে। নিজেকে অত্যন্ত অবসন্ন মনে হল তাঁর। আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে গেলেন।

বিছানায় শুতে যাবেন হঠাৎ বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা বো করলেন। নিমেষে তাঁর প্রাণ লুপ্ত হন। তিনি পড়ে গে মাটিতে।

একটা ভারী শব্দ শুনে লখমি চমকে গিয়েছিল। সে ছুটে এল ডঃ হুসেনের ঘরে। ডঃ হুসেনের মুখ দিয়ে দলা দলা ফেনা বেরোচ্ছে। লখমি আর্তনাদ করে উঠল।

তার কিছুক্ষণ আগে জাকার্তা বিমান বন্দরে রাত্রির শেষ বিমান থেকে ধীর পদক্ষেপে নির্গত হয়েছিল কমরেড শাহির। লম্বা লম্বা পা ফেলে করিডোরে এসে দাঁড়িয়েছিল।

কি মনে হল, পাবলিক টেলিফোনে গিয়ে ডায়াল ঘুরিয়ে একটা ফোন করল।

হ্যালো কে?

দেখুন ম্যাডাম আমি ১২ নং রুমের মিস লখমির সঙ্গে কথা বলতে চাই।

কিন্তু তিনি তো এখানে নেই।

কোথায়?

ডঃ হুসেনের বাড়িতে গেছেন।

কবে ফিরবেন?

সাত দিনের ছুটি নিয়ে গেছেন।

ধন্যবাদ!

ফোন ছেড়ে দিয়ে শীস দিয়ে ইন্টারন্যাশন্যাল গানের সুর ভাঁজল।

ট্যাক্সি······

শাহিরকে নিয়ে ট্যাক্সি ছুটল রাত্রির অন্ধকারে।

॥ পাঁচ ॥

নিজের বাড়ি থেকে প্রায় সাড়ে আট শ মাইল দূরে মিলিটারি ব্যারাকের একটি সুসজ্জিত ঘরে ব্রিগেডিয়ার জাহির একাকী বসে আছে। অত্যন্ত চিন্তান্বিত দেখাচ্ছে তাকে।

টেবিলে একটা আধ-খোলা কবিতার বই।

সামরিক বৃত্তি জীবিকা হলেও, কাব্যের প্রতি অনুরাগ তার বাল্যকাল থেকেই।

একটা সিগারেট জ্বালিয়ে চুপচাপ ধূমপান করল জাহির। তারপর আবার কবিতার বইটি খুলে পড়তে লাগল।

বইটি ইন্দোনেশিয়ার বিদ্রোহী কবি খাইরিল আনোয়ারের লেখা বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। আধুনিক যুগের শিক্ষিত তরুণদের কাছে খাইরিল আনোয়ারের অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা।

একটি কবিতা পড়তে লাগল জাহির।

"বর্তমান আর ভবিষ্যতের সুখের মাঝখানে
অনাবৃত অতল গহ্বর।
তন্বী চোখে সরস আইসক্রীম ;
আজ সন্ধ্যায় তুমি আমার প্রিয়তমা,
সম্বর্ধনা করি তোমায় কেক-এ এবং কোকাকোলায়,
খেলা খেলার বউ !"

কবিতাটা শেষ করতে পারল না জাহির।

বইটা সশব্দে ছুঁড়ে মারল টেবিলে।

খাইরিল আনোয়ার কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী। জাহির এই মতাদর্শ দু চোখে দেখতে পারে না। নিছক কৌতূহল বসে বইটি নিয়ে বসেছিল।

কিন্তু প্রচণ্ড ধাক্কা খেল তিনটি শব্দে।

'খেলা খেলার বউ!'

কতকগুলি ফাজিল ছোঁড়া প্রগতির নাম করে দেশটাকে জাহান্নমে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তাদের সঙ্গে জুটেছে মগজ-হীন ছুঁড়িরা।

'খেলা খেলার বউ!'

এই ছোঁড়া আর ছুঁড়ির দল জীবনের গভীর অনুভূতি থেকে বঞ্চিত। তরলমতি এই যুবক-যুবতারা সাময়িক আর বেপরোয়া স্ফূর্তি নিয়েই মত্ত।

বিয়েটা কি খেলার বস্তু?

বউ কি খেলার সহচরী?

দাম্পত্যজীবন ঈশ্বরের একটি মধুর দান। শুধু দেহ-উপভোগের মধ্যেই যারা সীমাবদ্ধ রইল তারা এর গভীরতা, ব্যাপকতা এবং আধ্যাত্মিকতার কতটুকু স্বাদ পেতে পারল।

হঠাৎ লখমির কথা মনে পড়ল জাহিরের। উজ্জ্বল দুটি চোখ, সমুদ্রের জলের মত গভীর মণি। সুগৌর তনু, সুঠাম দেহ ছন্দ, ললিত মসৃণ লাবণ্য।

সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি মুখ মনে পড়ল জাহিরের। তার ছোট ভাই শাহির। ঈষৎ কোঁকড়ানো চুলের তলায় সর্বদা কৌতুকে ভাসমান দুটি চঞ্চল চোখ অনর্গল কথা বলায় অক্লান্ত দুটি ঠোঁট। চতুর এবং আত্মবিশ্বাসে স্থিতধী একটি মানুষ।

একমাত্র ভাই শাহির, তদুপরি কনিষ্ঠ। কিন্তু কিছুমাত্র প্রীতিবোধ নেই ছোট ভাই এর প্রতি। কোন দিনই ছিল না।

পিঠোপিঠি ভাই। ছেলে বলে শাহির চিরকালই মায়ের আদুরে। যখন যা আবদার হত তিনি তৎক্ষণাৎ তা পূরণ করতেন।

তখন থেকেই শাহিরকে দুচোখে দেখতে পারত না জাহির, আর মনে মনে দারুণ হিংসা পুষে রাখত।

দুষ্টুমি করলেও শাহিরকে বকতেন না মা। অথচ জাহির সামান্য মাত্র অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করলে বলতেন, তুমি না বড় ভাই। তোমাকে দেখেই তো ও শিখবে।

তাই শিখেছে।

অল্প বয়সে মা মারা গেছেন। বাবার তীক্ষ্ণ নজরের মধ্য দিয়ে দু ভাই বড় হয়ে উঠেছে। সঙ্গে এসেছে লখমি।

জাহির গোঁড়া মুসলমান ; ইসলামের আইনকানুন পুরো মাত্রায় মেনে চলতে চায়। বড় ভাইকে দেখে শাহির কিছুই শেখে নি। সে কমিউনিস্ট। তার মতে ধর্ম হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড় আফিমের নেশা।

এই নেশার ঘোর ছাড়তে না পারলে বাস্তব জীবনকে সাদা চোখে দেখা যায় না।

রঙীন নেশায় সবকিছুর ভ্রান্ত ধারণা জাগে।

জাহির মনে মনে বলে, সব শয়তানের চেলা।

বস্তুতপক্ষে দু ভাই এর মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ।

একই বাড়িতে থাকে ; একই পরিবেশে মানুষ। অথচ দুজন সম্পূর্ণ বিপরীত। বাবা দু ভাই এর সম্প্রীতি আনার অনেক চেষ্টা করেছেন। সফল হন নি।

আরেকটি নিঃশব্দ বিরোধের কারণ লখমি।

অন্তরঙ্গ বন্ধু ডঃ সেনাপতির নিরুদ্দেশের ঘটনার পর তিনদিনের অসুখে হঠাৎ যখন লখমির মা মারা গেলেন, তখন লখমির কেউ নিকট আত্মীয় ছিল না।

খবর পেয়ে দেখতে গিয়েছিলেন ডঃ হুসেন। ফেরার পথে লখমিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

জাহির ও শাহির তখন কিশোর। ওরা কৌতুকের সঙ্গে ছোট মেয়েটিকে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল। যেন বাবা একটি খুকি-পুতুল নিয়ে এসেছেন।

দুজনেই খাতির জমাতে গিয়েছিল। কিন্তু জমে নি। লখাম চড়া গলায় বলেছিল, ওমা তোমরা কত বড় ছেলে। আমি কি তোমাদের সঙ্গে খেলা করতে পারি ? আমার ছেলে মেয়ে বউ বেহাই বেয়ান আছে। সব কাঠের পুতুল। আমি ওদের নিয়ে খেলা করি। তোমরা পড়তে যাও। নইলে উনি রাগ করবেন।

উনি তোমার কে ?

টেবিলে লেখাপড়ার কাজে ব্যস্ত ডঃ হুসেনকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলত শাহির।

ওমা জান না ? উনি বলেছেন, উনি আমার বাবা। বাবা বলে ডাকতে বলে দিয়েছেন।

না তোমার বাবা না। আমার বাবা।

মুখ ফুলিয়ে থাকত লখমি, বলত, না আমার বাবা।

কচু।

মুখ ভেংচে পালাত শাহির। সব দেখত, শুনত জাহির নিজে কিছু বলত না।

একটু বড় হতেই লখমির সঙ্গে শাহির জমিয়ে নিয়েছিল। অকারণে তুমুল ঝগড়া হত, আবার ভাব জমতেও দেরী হত না। সকালে ফুল তুলতে যেত দুজনে। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ত। জানালা দিয়ে দেখত জাহির।

দু চোখে জ্বালা ধরে যেত।

ওরা কি পরস্পরকে ভালবাসে ?

আজ এতদিন বাদে এই নিঃসঙ্গ সুসজ্জিত ঘরে জাহির কবিতার বই পড়তে পড়তে একথা আবার ভাবল। কিন্তু কমিউনিস্টরা প্রেমের কি বুঝবে ? ওদের কাছে দাম্পত্য জীবন তো খেলাঘরের খেলা মাত্র। 'খেলা খেলার বউ !'

ভেতরে আসতে পারি ?

বাইরে থেকে একটি গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। জাহির

চিনতে পারল, জেনারেল সুমিত্র এসেছেন। জেনারেল বয়সে বড় হলেও সম্পর্কে বন্ধু স্থানীয়।

জাহির ত্রস্তপদে দরজা খুলে দিয়ে হাসিমুখে বলল, আসুন।

সামরিক পোশাক পরা জেনারেল ভেতরে সোফায় এসে বসলেন। জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল জাহির।

খবর খুব খারাপ।

যেমন—

প্রেসিডেণ্ট বিদ্রোহ দমনের জন্য বিমান বহর পাঠাচ্ছেন।

মানে প্রেসিডেণ্ট কমিউনিস্টদের হুকুম মত কাজ করছেন। নিজের সব স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিয়েছেন।

তাছাড়া আর কি ?

কমিউনিস্টরাই হবে দেশের ভাগ্যবিধাতা ?

রকম সকম দেখে তাই তো মনে হচ্ছে।

তুজনই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। একটু পর জাহির বলল, আমাদের সম্পর্কে কি হবে ?

কি আবার হবে ? আমরা তুজনই বিদ্রোহের এলাকা থেকে অনেক দূরে। আমরা রুটিন মাফিক কাজ করে চলেছি।

কিন্তু বিদ্রোহের সঙ্গে আমাদের—

সম্পর্ক ? উচ্চ কণ্ঠে হাসল জেনারেল সুমিত্র। বলল, ধরবার কোন উপায় নেই। পাখি উধাও।

মানে ?

বিদ্রোহীদের সঙ্গে আমাদের একমাত্র সংযোগকারী সুবেদার রহমান কুয়ালালামপুরে পালিয়েছে।

মালয়েশিয়ানরা আবার ধরে জাভায় পাঠাবে না তো ?

দূর। টিঙ্কু তাকে আদর যত্ন করে রাজনৈতিক আশ্রয় মঞ্জুর করেছেন। লোকটার কাছ থেকে অনেক গোপন খবর পাওয়া যাবে বলে ওকে জামাই আদর করতে কসুর করছে না।

তবু…

কিচ্ছু না। জাকার্তা এবারকার বিদ্রোহ হয়ত দমন করতে পারবে। তাই আমরা আড়ালে থাকাটাই ভাল হয়েছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট যদি কমিউনিস্টদের তল্পিবাহক হয়ে ওঠেন, তাহলে ভবিষ্যতে বিরাট বিদ্রোহ দেখা দেবে। তাতে সমগ্র দেশ কেঁপে উঠবে। প্রেসিডেন্টও রেহাই পাবেন না।

আমাদের কিছু লোক অনর্থক প্রাণ হারাবেন। চিন্তিত মুখে বলল জাহির।

কিছুই অকারণ নয়, কিংবা ব্যর্থ নয়। এই প্রাণদানের মধ্য দিয়ে পরিশুদ্ধ ইন্দোনেশিয়ার জন্ম লাভ করবে।

আল্লা তাই করুন!

জেনারেল সুমিত্র বেশীক্ষণ বসলেন না। যাবার সময় বলে গেলেন, তোমার বাবার শরীর খারাপ বলে শুনেছি। তুমি ছুটি নিয়ে জাকার্তা ঘুরে এসো। রাজধানীর গোপন খরব জানতে পারবে।

উদ্বিগ্ন মুখে জাহির বলল, বাবার শরীর খারাপ কে বলল?

আজ বিকেলের সান্ধ্য পত্রিকায় যেন দেখলাম।

কোথায় পত্রিকা?

পকেট থেকে পত্রিকাটা বার করে টেবিলে রাখলেন জেনারেল সুমিত্র। বললেন, রসুল আল্লায় বিশ্বাস হারিও না। চলি।

জেনারেল ভারী পায়ের শব্দ ফেলে ফেলে চলে গেলেন। পত্রিকাটায় বাবার খবর খুঁজতে লাগল জাহির

খবরটা বার করতে দেরি হল না। 'শোক সংবাদ' হেডিং দিয়ে কালো বর্ডারের মধ্যে লেখা আছে ঃ

"আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, প্রবীণ সোসালিস্ট নেতা ও বুদ্ধিজীবী ডঃ মহম্মদ হুসেন গতকাল রাত্রে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক-গমন করেছেন। তিনি শ্রদ্ধেয় শহীদ ডঃ সেনাপতির

সতীর্থ হয়ে আমস্টার্ডম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। দেশে ফিরে অধ্যাপনাকেই ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তাঁর আবির্ভাব ঘটে ত্রিশ দশকে। কয়েকজন নির্যাতিত কর্মী ও বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তিনি সোসালিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুকালে তাঁর দুই পুত্র ব্রিগেডিয়ার জাহির এবং কমরেড শাহির দুইজনই অনুপস্থিত ছিলেন। কন্যাসমা কুমারী লখমি ছাড়া তাঁর শেষ নিঃশ্বাসের সময় কেউ উপস্থিত ছিলেন না। আমরা পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।"

জাহিরের মুখ থেকে একটি মাত্র কথা বেরোল, খোদা হাফিজ!

॥ ছয় ॥

চার বছর পর।

বান্দুং শহরের মিলিটারী কম্পাউণ্ডে লেঃ কর্ণেল জাহিরের সুন্দর সাজানো গোছানো কটেজে এক সন্ধ্যায় কাগজের মালা, ফুলের সমারোহ ও উজ্জ্বল আলোর রোশনাই। কিছু নিমন্ত্রিত অতিথি সমবেত হয়েছেন। গান ও নাচের আয়োজন হয়েছে।

দেশীয় পোশাক পরে লেঃ কর্ণেল জাহির সকলকে আপ্যায়ন করছেন। তার কোলে কয়েক মাসের একটি সুন্দর শিশু। সকলেই শিশুকে আদর করতে ব্যস্ত।

মিসেস রফিউদ্দীন আপনি তো কিছুই খেলেন না দেখছি।

অনেক খেয়েছি। আর পারি না।

জামাল তুমি কিন্তু এক্ষুনি পালিও না। একটা ছোটখাটো নৃত্যনাট্যের ব্যবস্থা আছে।

তোমার মিসেস নাচবেন কি?

না, তিনি নাচাতেই ব্যস্ত।

কি নাচ? বাঁদর নাচ নাকি?

তা আর বলতে।

ব্রিগেডিয়ার রহিম, পেট ভরে খাবেন ভাই। বিনয় করে বলছি না, মেনু কিন্তু সংক্ষিপ্ত।

অতিথিদের ঘিরে লেঃ কর্ণেল জাহিরের আনন্দিত কণ্ঠের কথাগুলি সরব হয়ে উঠেছিল।

আজ তার তৃতীয় বিবাহ-বার্ষিকী।

তোমার মিসেস কোথায় জাহির?

কে একজন প্রশ্ন করল।

এক্ষুনি আসছেন। নৃত্যনাট্যের ব্যবস্থা করছেন।

তোমার ছেলেটি ভারী সুন্দর হয়েছে। একেবারে মায়ের মত দেখতে। প্রবাদ জান তো, মাতৃমুখী পুত্র নিশ্চিত সৌভাগ্যের অধিকারী।

আপনি দোয়া করুন।

খাওয়ার পাট চুকলে সবাই গিয়ে বারান্দায় বসলেন। বাড়ির সামনে বিরাট ঢাকা বারান্দা। একদিকে নাচের মঞ্চ বসেছে, অন্যদিকে দর্শকদের চেয়ার।

মিসেস জাহির এগিয়ে এল সকলের সামনে। মুখে প্রীতির হাসি। সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাল সে।

সকলেই একবাক্যে বলে উঠলেন, লেঃ কর্ণেল জাহির এবং মিসেস লখমির এই সুখের উৎসব বারবার ফিরে আসুক।

অভ্যাগতদের মধ্যে শুধু একজনের ঠোঁটই মূক। তার কণ্ঠে কোন ধ্বনি নেই। সে সুলতানা।

লখমির অন্তরঙ্গ বান্ধবী। স্কুল কলেজের সতীর্থা, বিভাগীয় বিপনীতেও ছিল সহকর্মী। আবার বিবাহিত জীবনেও নিকট প্রতিবেশী। সুলতানা মেজর জেনারেল লতিফের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।

জাহিরের সঙ্গে হঠাৎ লখমির বিয়ে হয়ে যাওয়াটার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পায় নি সে। জিজ্ঞেস করেও জবাব পায় নি লখমির কাছ থেকে। তথাপি ভাল মনে নিতে পারে নি তাদের আকস্মিক বিবাহের গাঁটছড়া।

লখমি একবার নিঃশব্দে তাকিয়ে দেখলো সুলতানার মুখের দিকে। সেখানে বিস্ময় নেই, ক্রোধ নেই, আনন্দ নেই। রঙহীন কৌতূহলহীন সে মুখ।

লখমি হেসে উঠল।

বলল, আমাদের জুনিয়র ক্লাব আজ "দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ"

নৃত্যনাট্যটি অভিনয় করবে। আশা করি ওরা আপনাদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হবে।

বিবাহ-বার্ষিকীতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ!

দর্শকবৃন্দ সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন।

এই আচমকা উল্লাসের অর্থ বুঝে লখমি ও অন্যান্য মেয়েদের মুখ লজ্জারুণ হয়ে উঠল।

কিন্তু আচমকা একটা কথা মনে পড়ে গেল সুলতানার। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে লখমি কি বিশেষ কিছু ইঙ্গিত করতে চাইছে; সামান্যতার মধ্যে কি অসামান্য কোন অর্থ লুকিয়ে আছে?

নৃত্যনাট্য জমে উঠতে দেরি হল না।

কুলবধূ দ্রৌপদীর শ্লীলতাহরণের উদ্দেশ্যে দুর্মদ দুঃশাসন বস্ত্র টানছে তো টানছেই, বস্ত্র ভূমিতে পর্বতপ্রমাণ হয়ে স্তূপ স্তূপ জমছে, কিন্তু দ্রৌপদীর অঙ্গে বস্ত্রাবরণ অব্যাহত থাকছে। অবশেষে ক্লান্ত শ্রান্ত দুঃশাসন দুষ্কার্যের ক্ষান্তি দিয়ে রেহাই পেল। দ্রৌপদী রক্ষা পেল লজ্জাহরণের অপমান থেকে।

তুমুল হাততালিতে পূর্ণ হয়ে গেল বারান্দা। একটু অদ্ভুত চোখ নিয়ে লখমির দিকে তাকিয়ে দেখল সুলতানা। লখমিও তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। চোখাচোখি হতে বিষণ্ণ হাসি হেসে উঠে গেল নিজের চেয়ার থেকে।

ছেলেকে কোলে নিল লখমি।

আস্তে আস্তে নিমন্ত্রিত অতিথিরা বিদায় নিতে লাগলেন। মেজর জেনারেলের সঙ্গে সুলতানাও চলে গেল।

ফাঁকা হয়ে গেল বারান্দা।

লেঃ কর্ণেল জাহির অতিথিদের এগিয়ে দিতে গেছে।

ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে পাতলা র‍্যাপার গায়ে ছড়িয়ে দিল। একরাশ ফুলরাশির মত সৌন্দর্যে ঢলঢল ছেলের মুখ। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ছেলের কপালে স্নেহসিক্ত চুমো এঁকে দিল লখমি।

বারান্দায় এসে দাঁড়াল লখমি।

উৎসব শেষে নানা জিনিসপত্র এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে চারদিকে। আজ ওগুলো ওভাবেই থাকুক, কাল সকালে গুছিয়ে রাখা যাবে।

আকাশের দিকে তাকাল লখমি। সাদা তুলোর মত মেঘগুলি ভেসে চলেছে কোথায়, কে জানে! তারই ফাঁকে ফাঁকে স্নিগ্ধ আলোর প্রসন্ন চাঁদের মুখ দেখা যাচ্ছে।

চাঁদের মুখে কি কৌতুকের হাসি? হঠাৎ কথাটা মনে হল লখমির। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল চাঁদের দিকে।

যুগ যুগ ধরে চাঁদ তাকিয়ে আছে মানুষের দিকে। দেশে দেশে নিরবধি কালের স্রোতে কত মানুষের ধারা দেখছে, তবু মুখে শব্দটি নেই।

কত আশাভঙ্গ, কত ষড়যন্ত্র, কত যন্ত্রণা।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষের জীবনে কত নিরতিশয় বিস্ময়ের রামধনু। মানুষের অহংকার, মানুষের অপমান, মানুষের সাম্রাজ্য গঠন আবার তাসের প্রাসাদের মত তার ধূলায় ধূলিসাৎ।

কতটুকু মানুষের জীবন। নিরবধি কালের সামান্য একটি বুদ্বুদেরও অণু পরিমাণ সময় মাত্র।

তারপরই আয়ুর অবসান; জীবনের যতিচিহ্ন।

কি ভাবছ?

চমকে উঠল লখমি। লেঃ কর্ণেল জাহির কখন নিঃশব্দে পেছনে এসে তার পিঠে হাত রেখেছে।

ম্লান হেসে লখমি বলল, না, কিছু না।

বলোই না শুনি। এই সুন্দর চাঁদনি রাত—

এসো, শুতে যাই। সারাদিন শরীরের ধকল তো কম হল না।

শোনো। প্রায় চুপি চুপি বললো জাহির।

কি ?

তুমি কি এখনো আমার উপর রাগ করে আছ ?

সে আবার কি কথা ?

হুঁ।

স্ত্রীর কটিদেশে হাত রেখে বুকের কাছে ঝুঁকে এলো জাহির, বলল, তুমি কি এখনো আমাকে ক্ষমা করো নি ?

ওসব বিশ্রী কথা ছাড়। ছেলের অমঙ্গল হবে।

ছেলে ! ছেলে আমার সোনামণি।

জান একটা সুখবর দেবো।

কি ?

আজ জাকার্তা থেকে চূড়ান্ত অর্ডার এসেছে। সুরবাজা শহরে ওলন্দাজদের বিরাট টিন ফ্যাক্টরির চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে তিন বছরের জন্য কাজ করতে হবে।

সুরবাজা !

কেন ভয় পেলে নাকি ?

না, শুনেছি সুরবাজা কমিউনিস্টদের শক্ত ঘাঁটি। এক মুহূর্তের ডাকে সেখানে নাকি ওরা দশ লক্ষ লোকের মিছিল বার করতে পারে।

তা হয়ত হবে। কিন্তু তাতে আমাদের কি? মিলিটারী ক্ষমতাকে ভয় করে না দেশে এমন কোন শক্তি নেই।

কবে রওনা হবে ?

তিন চার দিনের মধ্যেই রওনা হতে হবে।

নিঃশব্দে স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল লখমি। বলল, চলো ঘরে যাই।

এই চাঁদের আলোয় এখানেই তো বেশ লাগছে।

আমার ঘুম পাচ্ছে।

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল জাহির। তারপর উঠে এল ঘরে। একটা সিগারেট জ্বালালো।

অর্ডারটা আমি কালই পেয়েছি। আজ বলব বলে চেপে রেখেছিলাম।

ডাচ সম্পত্তি জাতীয় করণ করে নিয়েছে সরকার। প্রথমে বিক্ষুব্ধ শ্রমিক আর ছাত্ররা ওলন্দাজদের খনি, ব্যবসা, কারখানা অধিকার করে নিয়েছিল। পরে সরকারী আদেশে সামরিক বাহিনীর কর্তাদের উপর সম্পত্তি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

পরিচালকরা ক্ষমতার আস্বাদ যেমন পাচ্ছেন, তেমনি ব্যক্তিগত ভাবে নানা লাভে, উপহারে, ঘুষে স্ফীত হয়ে উঠছেন।

কিন্তু সুরবাজা!

স্থানটা মনঃপূত হয় নি জাহিরের। কিন্তু এই সৌভাগ্যকেও অগ্রাহ্য করতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে উঁচু মহলের আদেশ সে গ্রহণ করে নিয়েছে।

এখন স্ত্রীর কথা শুনে আবার সুরবাজার কথা ভাবল। দূর ছাই! আজ আর ভাবতে ভাল লাগছে না। আজ এই উৎসবের শেষ মুহূর্তে স্ত্রীকে আদর করতে ইচ্ছে করছে।

লখমি?

বলো?

তুমি সুখী হয়েছ?

ফিক করে হাসল লখমি, কী কথা! যেন, তুমি মা হয়েছো?

না। মা হওয়া আর সুখী হওয়া এক কথা নয়।

আমার কাছে একই। মেয়ে মানুষের সুখ মাতৃত্বে। শুধু সুখ নয়, পূর্ণতাও!

॥ সাত ॥

শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল জাহিরের।

প্রথমেই চোখ পড়ল ছেলের দিকে। র‍্যাপারটা ঠিকঠাক করে দিল। ছেলের মুখে মিটিমিটি হাসি। বুঝি খুশির স্বপ্ন দেখছে।

লখমিও ঘুমিয়ে আছে আঘোর নিদ্রায়। ধীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে ওর বুক উঠা-নামা করছে।

ভোরের পাখি এখনো কাকলি শুরু করে নি।

ক'টা বাজে ?

দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল জাহির। চারটে। হঠাৎ ভয় পাওয়া চোখে আবার ঘড়ির দিকে তাকাল জাহির। সেকেণ্ডের কাঁটা দ্রুত ঘুরে চলেছে টিক টিক শব্দ করে। মোটা ছোট কাঁটাটা চারটের ঘরে।

সেই নিশুতি পাওয়া রাত চারটে।

একটু কেঁপে উঠল জাহির।

লখমি তেমনি অঘোর নিদ্রামগ্ন। সুন্দর শরীরটা একটা পাশ বালিশ ঘিরে লতার মত পড়ে আছে।

বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল জাহির।

চটিতে পা গলিয়ে দরজা খুলে বাইরে এল। চাঁদের রূপোলি আলো নিস্তব্ধ পৃথিবীর উপর মনোরম চাদর ফেলে ঢেকে রেখেছে।

বারান্দা থেকে ঘরের ভেতরটা দেখল জাহির। লখমি তেমনি অসাড়ভাবে ঘুমিয়ে আছে।

তিন বছর আগে সেদিনও রাত চারটে। জাকার্তার বাড়িতে জাহির বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে এসেছিল জাহির।

তখন বাবার দেহ কবরের তলায় চিরকালের মত রাখা হয়েছে। চঞ্চল শাহির স্তব্ধ, স্নেহময়ী লখমির চোখে অশ্রু শুকোয় নি।

বাড়িতে কিছুমাত্র শব্দ শোনা যায় না।

বুড়ী রোশনারা একেবারে পাথরের মত হয়ে গেছে। নিঃশব্দে নিত্যকার কাজগুলি সারে। সুলেমান চুপচাপ কোথায় বসে থাকে।

বাইরের ড্রইং রুমে ডঃ হুসেনের বিরাট তৈলচিত্র টাঙান হয়েছে। সকালে বিকালে নানা লোক আসে, শ্রদ্ধা নিবেদন করে যায়।

তখন সেখানে ডাক পড়ে শাহিরের।

জাহির নিজের ঘরে চুপচাপ শুয়ে থাকে। তার মনে হচ্ছিল যেন, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। জীবনে যেন আর কোথায়ও নির্ভর করার, আশ্রয় নেওয়ার কেউ নেই।

খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল।

বুড়ী রোশনারা বলত, এত কি চিন্তা কর ছেলে? বড় হয়েছ না?

হুঁ।

বাবা মা কি চিরকালই থাকে?

হুঁ।

খাওয়া-দাওয়া কর, বাইরে বন্ধুদের কাছে যাও, দিনরাত এমন ভাবে বাড়িতে বসে থেকো না।

হুঁ।

খালি হুঁ। হ্যাঁ কিংবা না বলতে পার না ছেলে? দেখো তো শাহির কি এত মনমরা হয়ে আছে?

হুঁ।

জবাব না পেয়ে রাগ করে চলে গিয়েছিল বুড়ী রোশনারা।

সারা রাত খালি শুয়ে থাকাই সার হত জাহিরের, ঘুম হতো না।

ভোরের দিন কি আলো রাতের অন্ধকারকে ছিন্ন করলে, জাহির দরজা খুলে বারান্দায় আসতো।

নিঃশব্দে লঘু পায়ে পায়চারী করত।

সারা পৃথিবী তখন সুষুপ্ত।

নিজেকে অনাথ, নিরাশ্রয় মনে হত। জীবনটা নিরর্থক বলে মনে হতো তাঁর।

একদিন লখমির ঘরে জানালা দিয়ে চোখ গেল। বিছানায় শুয়ে লখমি ঘুমিয়ে আছে। তাকেও বড় নিরাশ্রয় মনে হল।

পরের রাত্রিতেও ঠিক তাই হল।

তার পরের রাত্রিতেও তাই।

রাত চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে জাহির বারান্দায় পায়চারি করে বেড়ায়। অস্ফুট আলো এসে রাত্রির অন্ধকারকে কাটে।

খোলা জানালা দিয়ে দেখা যায় ঘুমন্ত লখমির লাবণ্যময় মুখ। সে মুখে অশ্রু শুকোয় নি।

আর বিজলীর মত অট্টহাসি দিয়ে ঝিলিক দিয়ে যায় একটা কথা।

লখমি কি শাহিরকে ভালবাসে?

কিশোর বয়স থেকে ওরা তুজনের অন্তরঙ্গ। ঝগড়াঝাঁটি যেমন, প্রীতির টানও তেমনি।

কিন্তু প্রেমের কি বোঝে ওরা!

এই কমিউনিস্টরা!

মুহূর্তের আনন্দের বাইরে তাদের চোখ যায় না। প্রেম যে কত গভীর, কত ব্যাপক, কত অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত নিয়ত স্নিগ্ধ, তার কতটুকু জানে এই সাময়িক স্ফূর্তি লোটার অবিবেচক মানুষরা।

লখমি কি কোনদিন তাকিয়ে দেখেছে জাহিরের দিকে? তার বাইরের গম্ভীর আচার আচরণের তলায় যে কত দ্রুত সঞ্চারমান প্রেমের গভীর স্রোত লুকিয়ে আছে, তা কি কোনদিন বুঝতে চেয়েছে।

দ্রুত পদক্ষেপে সরে যেত জাহির। নিজের এই চঞ্চল রূপ সে কারো কাছে তুলে ধরতে চায় না।

সেদিনও ঠিক রাত চারটে।

লখমির ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল জাহির। বিছানায় লতানো শরীর নিয়ে কুঁকুড়ে পড়ে আছে লখমি।

একটা সিগারেট ধরাল জাহির।

তার মন ইস্পাতের মত দৃঢ়।

দরজায় একটু ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। হয়ত ছিটকিনি দিতে ভুলে গিয়েছিল লখমি।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল জাহির। সন্তর্পণে জানালার ছিটকিনি দিল।

সুইচ টিপে নিঃশব্দে বাতি জ্বালালো।

ঠিক তক্ষুনি জেগে উঠল লখমি। ঘুমে জড়ান চোখ তুলে প্রায় চিৎকারের মত করে উঠল, কে?

জাহির মুখে তর্জনি তুলে ইঙ্গিত করল, চুপ!

ঘুমের ঘোর কেটে গেল লখমির, তার চোখে একরাশ বিস্ময় ভয়ে মেশানো।

কি চাই?

তোমাকে।

তীব্র ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকাল লখমি, আপনি চলে যান। নইলে আমি চিৎকার করব।

চিৎকার করে নিজের বিপদ টেনে এনো না।

কি চান?

বললাম তো, তোমাকে।

এবার হাসল লখমি। বলল, বেশ তো, সকালে বলবেন।

না, আমি এক্ষুনি কথাটা শেষ করব।

পকেট থেকে কতকগুলো কাগজপত্র বার করল জাহির। সেগুলি লখমির কাছে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, পড়ে দেখো।

আমার পড়তে ইচ্ছে করছে, না, আপনি বলুন।

না, তুমি নিজে দেখো।

একটা কাগজ অবহেলাভরে তুলে নিল লখমি। চোখের সামনে ধরল। পড়তে চেষ্টা করল, ক্রমশ চোখের তারায় সঞ্চারিত হল উত্তেজনা।

শাহিরের হাতের লেখা একটি চিঠি। অত্যন্ত গুরুতর নির্দেশ দিয়ে এক কমরেডকে লেখা। প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সশস্ত্র আয়োজনের সুনিপুণ পরিকল্পনা।

আরো আছে।

কি ?

এমনি চিঠিপত্র, দলিল, ম্যাপ। তাছাড়া টেপরেকর্ডে কণ্ঠস্বরও তোলা আছে।

কি বলতে চাইছেন ?

প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে শাহির বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করেছে। ধরা পড়লে ফাঁসি হবে।

আমি কি করব ?

তুমি তাকে বাঁচাতে পারো।

আমি কে ? বাবা নেই, আপনি বড় ভাই হয়ে আমাকে বাঁচাতে বলছেন কেন ?

হুঁ।

বলুন।

কাগজগুলো দেখেছ। দুপুরবেলা আমার ঘরে যেও টেপরেকর্ড বাজিয়ে শোনাব।

আমার শুনে কি লাভ ?

তোমার জানা থাকা ভাল।

কেন ?

কাল বিকেলে এগুলো আমি হেডকোয়ার্টারে জমা দেব। মামলা লড়তে হবে, প্রমাণগুলি তোমার জানা থাকা ভাল।

আমি কি করব ?

তুমি শাহিরকে বাঁচাতে পারো।

নিঃশব্দে জাহিরের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। জবাব দেয় নি।

তুমি যদি রাজী হও, আমি বিয়ের ব্যবস্থা করব। বিয়ের রাত্রে সব প্রমাণ তোমাকে উপহার দেব। তুমি পুড়িয়ে ফেলার সুযোগ পাবে। নতুবা—

নতুবা কি ?

নতুবা এগুলো যথাস্থানে জমা পড়বে।

আপনি যান, যান, যান। দোহাই—

কেঁদে লুটিয়ে পড়েছিল লখমি।

আমি যাচ্ছি। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমার জবাব চাই।—

ছিটকিনি খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল জাহির। তখনো বাইরের পৃথিবীতে ভোরের কাকজ্যোৎস্না অস্পষ্ট আলোয় জড়িয়ে আছে।

সেই নিশুতি রাত্রি তিন বছর আগে পেছনে রেখে এসেছে জাহির।

আজও সিগারেট জ্বালিয়ে বারান্দায় পায়চারী করছে জাহির। গত রাত্রির উৎসবের জিনিসপত্র তেমনি ছড়িয়ে আছে চারদিকে।

উৎসব আর আনন্দের বিবাহ-বার্ষিকী।

লখমি কি সুখী হয়েছে ?

লখমি এই সংসারের কর্ত্রী। সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলে উপহার দিয়েছে জাহিরকে। অনেক রোমাঞ্চিত মুহূর্তের নর্মসহচরী।

তবু আজো জাহিরের মনে প্রশ্ন জাগে, লখমি কি সুখী হয়েছে?

এ প্রশ্নের জবাব দেয় না লখমি। শুধু হাসে।

অতল রহস্যের আবেশে ঘেরা নারীর হৃদয়। কতটুকু তার বোঝা যায়, কতটুকু যায় চেনা?

বিয়ের কথা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে শাহির বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল।

রোশনারাকে বলে গিয়েছিল পার্টির কাজে বোর্ণিও যাচ্ছে।

বিয়ের রাত্রে ফেরে নি।

আজ পর্যন্ত আর দেখা হয় নি তার সঙ্গে। কোথায় আছে কে জানে!

কমিউনিস্ট পার্টি ছেলেটার মাথা খেয়েছে। নইলে খুব খারাপ হতো না ছেলেটা।

শাহিরের প্রতি আর বিদ্বেষ নেই জাহিরের। তার বদলে কোথায় একটা অপরাধ বোধ এসে বাসা বেঁধেছে।

লখমি কি সেদিনের কথা ভুলে যেতে পেরেছে? কে জানে!

॥ আট

বান্দুং থেকে বাস ছাড়ে সকাল সাড়ে সাতটায়, জাকার্তায় এসে পৌঁছোয় বিকাল ছ'টায়।

পুরো সাড়ে দশ ঘণ্টার বাস ভ্রমণ।

অনর্থক এতটা সময় নষ্ট। কেননা গড়ুর বিমান পরিবহনের কোন বিমানেই আর জায়গা নেই।

শাহির, বাসে ড্রাইভারের পাশে বসে পড়ল।

এখানে ঝাঁকুনি কম। তাছাড়া প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে বেশ আরামে যাওয়া যায়।

ধান ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে ছুটে গেছে রাস্তাটা, কখনো জঙ্গলকে দুভাগে খণ্ডিত করেছে। পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠেছে, নদীতে বাঁধানো সাঁকোর বুকে সস্নেহে স্পর্শ রেখে সামনের দিকে ছুটেছে।

বান্দুং থেকে জাকার্তা; জাভা দ্বীপটাকে এই রাস্তায় যেতে যেতে অনেকখানি বোঝা যায়।

দূরে দূরে গ্রাম। কখনো পথে পড়ে শহর, গঞ্জ, সিনেমা হল, কল কারখানা, স্কুল, কলেজ, রবারের এস্টেট, নানা ধরনের খনি।

কি বিশাল এই দেশ, আর তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কত। দেখতে দেখতে মন খারাপ হয়ে যায় শাহিরের।

জন্মভূমি দুহাত ভরে থরে থরে কত সম্পদ সাজিয়ে বসে আছে, অথচ দেশের কোটি কোটি মানুষ আজো অন্নের অভাবে, শিক্ষার অভাবে, চিকিৎসার অভাবে, দুঃস্থ জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়।

এই সম্পদ আহরণ করার পরিকল্পনা মত সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা নেই।

আগে ওলন্দাজরা যত পারে লুটে নিয়েছে। সে লুণ্ঠন এখন চিরকালের জন্য বন্ধ করা গেছে।

অথচ সুব্যবস্থা নেই।

অর্থনীতি ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ নেই।

যদি থাকত তাহলে দেশের অভাব কয়েক বছরের মধ্যে দূর করে দিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় সমৃদ্ধ সভ্যতার উন্মেষ ঘটান যেত।

কিন্তু তা হয় নি।

মতের বিরোধ, স্বার্থের বিরোধ, ব্যক্তিগত বিরোধ দূর করে দিয়ে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কথাকেই সবার আগে বসান যাচ্ছে না।

শাহির একটা সিগারেট ধরাল।

জাকার্তায় তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। পার্টি অফিস থেকে জরুরি ডাক এসেছে।

ইন্দোনেশিয়া কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি বিপ্লবই দেশের বর্তমান পরিবেশে একমাত্র মুক্তির উপায়।

প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ 'বিপ্লব' জিনিসটাকে ঠিক ধরেছেন।

কিন্তু কাজে লাগাতে পারছেন না।

তিনি বিপ্লব বলতে পরদেশের সাম্রাজ্যলিপ্সাকে পরিহৃত করার কথা ভাবেন। কিন্তু দেশের মধ্যে শ্রেণী স্বার্থের এবং সামন্ততান্ত্রিক মনোবৃত্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বিপ্লবকে কাজে লাগাতে পারেন না।

বিপ্লব তো বাইরের জিনিস নয়, দেশের ভেতরের জিনিস। দেশের অভ্যন্তরে জনগণ বিরোধী যে স্বার্থের চক্রান্ত চলছে তাকে ধ্বংস করার নামই হবে বিপ্লব।

কমরেড আইদিতিকে ধন্যবাদ, তিনি কমিউনিস্ট পার্টিকে নির্ভুলভাবে পরিচালনা করছেন।

সোভিয়েট রাশিয়া আর লাল চীন ছাড়া পৃথিবীর কোন দেশে এত বৃহৎ এবং এত শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি নেই।

প্রায় চার লক্ষ মানুষ কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। লক্ষ লক্ষ ছাত্র, যুবক, অফিসের কর্মী, কারখানার শ্রমিক এবং ক্ষেতের কৃষক কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন।

সামরিক বাহিনীর মধ্যেও নানা স্তরের লোক কমিউনিস্ট পার্টির নামে এগিয়ে আসে।

কমিউনিস্ট পার্টির মিটিংগুলির মত এত বিশাল সমাবেশ আর কোথায় দেখা যায়?

প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ জাতির কাছে এখনো দারুণ জনপ্রিয়। তাঁর বক্তৃতার সময়ও এত উদ্দীপনা দেখা যায় না।

সুকর্ণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি, সারা দেশে কমিউনিস্ট পার্টির জনপ্রিয়তা তিনি অস্বীকার করেন না। আজ মন্ত্রিসভার পাঁচজন সদস্যই কমিউনিস্ট। তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলো চালাচ্ছেন।

কমিউনিস্ট পার্টির জনপ্রিয়তা ও শক্তি অনস্বীকার্য।

কিন্তু এই পার্টির প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণাও প্রচণ্ড। ইসলামী শরিয়তী-বাদী এবং উলেমাগণ কমিউনিস্টদের সাপের মত পরিত্যজ্য মনে করে।

কমিউনিস্টরা আল্লা মানে না।

জাতীয়তাবাদের জয়ধ্বনি দেয় না।

ওরা সারা বিশ্বের শ্রমিক, কৃষক ও বিত্তহীনদের এক ভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন দেখে।

বিদ্বেষীদের কাছে কমিউনিস্টরা বিদেশীর দালাল। চীনের চর। দেশটাকে বিদেশীদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যই নাকি তাদের দিন রাত্রি ঘুম হচ্ছে না।

হাসল শাহির। ভাবল, যারা জেগে জেগে ঘুমোয় তাদের ঘুম ভাঙান যায় না।

ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বলল, সিগারেট চলবে?

শাহিরকে চেনে বাস ড্রাইভার। বলল, আপনি খান।

আরে নিন না।

ড্রাইভারের হাতে জোর করে সিগারেট গুঁজে দিল শাহির। সে বুঝল, ড্রাইভার তাকে নেতা হিসেবে চিনতে পেরেছে, তাই সবিনয়ে সম্মান জানাল।

এই নেতা হওয়ার বিড়ম্বনা। দিল খুলে মিশতে পারে না। পূজনীয়-পূজনীয় ভাব করে লোকে খানিকটা দূর করে রাখে।

সিগারেট ধরিয়ে শাহির জিজ্ঞেস করল, বাল বাচ্চা বিবি কোথায় থাকে ?

বান্দুংএর শহরতলীতে ছোট্ট একটা ডেরা তৈরি করেছি। সেখানেই ওরা আমার পরিবার।

তুইজনের দৃষ্টিই সামনের দিকে। ঢেউখেলানো কালো পিচের রাস্তায় দ্রুত বেগে ছুটে চলেছে বাস। তুদিকে ধাপে ধাপে সবুজ ধানের ক্ষেত সামনের রোদে ঝিকিমিকি হাসছে।

পরিবার! মনে মনে চিন্তা করল শাহির ; হয়ত তুটি বা তিনটি ছেলেমেয়ে আর বউ। সারাদিন পরিশ্রমের পর ড্রাইভার যখন বাড়িতে ফেরে, তখন হয়ত লক্ষ্মী বউটি স্বামীর কাছে এসে রুমাল দিয়ে ঘাম মুছে দেয়। একটু পাখার হাওয়া করে।

তাড়াতাড়ি চা খাবার এনে পাশে রাখে।

হয়ত সোনার সংসার!

কিংবা···

না না না। এ যেন কোন শত্রুরও না হয়। কোন অবিশ্বাসিনী নারী···

দূর কি কথা মনে পড়ছে আজ এই সকালে।

চুপচাপ বসে ভাবতে লাগল শাহির।

পার্টি অফিস থেকে হঠাৎ জরুরি তলব এল কেন, সে জানে না। হয়ত দূরের কোন দ্বীপে যেতে হবে সংগঠনের ভার নিয়ে।

কিংবা শত্রুদের আঘাতের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে হবে জঙ্গী লেবার ইউনিয়ন বা কৃষক সমিতিকে।

যা নির্দেশ হক, কায়মনোবাক্যে তা পালন করবে।

জনসাধারণকে জাগ্রত করে তুলতে হবে, পার্টির পাতাকাতলে সুসংগঠিত করে তুলতে হবে।

কেননা, আজ হক কিংবা কালই হক, দেশের মুখোমুখি দুই প্রবল প্রতিপক্ষের মধ্যে কঠোর ও তুমুল অন্তর্দ্বন্দ্ব ছাড়া ইন্দোনেশিয়ার মুক্তির পথ নেই।

সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জন্য দেশকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। কোথায় কোন নারী তার সঙ্গে নিষ্ঠুর বিদ্রূপের ভেতর দিয়ে জীবনটাকে স্থির ভিত্তি থেকে নড়িয়ে দিয়ে একটা তিক্ত যন্ত্রণার আঘাত দিয়ে গেল, সে কথা আজ আর স্মরণ করে কি লাভ?

একটি নারী থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্যপালন।

আর সে নারী যদি বিশ্বাসঘাতিনী হয় তাহলে সে তো ব্যাভিচারিণীর মত ঘৃণ্য।

শাহির চোখ বন্ধ করে আঙুল দিয়ে মাথা টিপে ধরল। চোখে যন্ত্রণা, নাকি জলের আভাস?

বাস ড্রাইভার বলল, কমরেড, জব্বর লড়াই সামনে। না?

হাসল শাহির। বলল, হ্যাঁ।

সামনে লড়াই। দেশপ্রেমের লড়াই। চুলোয় যাক। একটি ব্যভিচারিণী নারী—

প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আস্থাশীল। তিনি সামরিক বাহিনী, কমিউনিস্ট পার্টি এবং ইসলাম বাদীদের ঐকমত্য অর্থাৎ 'নাসকম' এর মারফত রাষ্ট্র শাসন-ব্যবস্থা চালিয়ে যেতে চান।

কিন্তু সুকর্ণ প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে অদৃশ্য হলেই দেশের এই তিন প্রবল শক্তির মধ্যে ভয়াবহ সংঘাত বাধবে। এই সংঘাত অনিবার্য।

এই প্রচণ্ড ও রক্তাক্ত সংঘর্ষের জন্য দেশকে সুসংগঠিত করাই এখন প্রত্যেক দেশপ্রেমীর জরুরী কর্তব্য।

॥ নয় ॥

চলুন স্পোর্টস স্টেডিয়াম !

শুধু শহর জাকার্তা নয়, ইন্দোনেশিয়ার সমস্ত শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে লাল পোস্টার পড়েছে : চলুন স্পোর্টস স্টেডিয়াম।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা।

জুম্মাবার বিকেলে দশ হাজার যুবক সারিবদ্ধভাবে সাইকেল চালিয়ে রাস্তায় রাস্তায় পরিভ্রমণ করল। প্রত্যেকের হ্যাণ্ডেলে লাল পতাকা।

সারা শহরে শুধু এক কথা, চলুন স্পোর্টস স্টেডিয়াম। যাঁরা যাবেন, তাঁরাও বলছেন। যাঁরা যাবেন না, তাঁরাও বলছেন।

মানুষের মনে একটা দারুণ উত্তেজনা।

রাজনৈতিক দলগুলির ব্যস্ততার অন্ত নেই। শুধু স্তিমিত মাসজুমি পার্টি। ওঁরা বিপদের আশঙ্কা করছেন।

জাতীয়তাবাদী পি এন আই দলের নেতাদেরও ব্যস্ততার অন্ত নেই। তাঁরাও পথসভা করছেন, মিছিল বার করছেন, পোস্টার ছাড়ছেন।

খোদ সরকারও চুপচাপ নেই। খবরের কাগজে তাঁরাও বিজ্ঞাপন দিয়েছেন :

স্বাধীনতা দিবসে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ স্পোর্টস স্টেডিয়াম গ্রাউণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন।

চলুন স্পোর্টস স্টেডিয়াম !

সারা দেশের চোখ প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের দিকে।

'সুকর্ণ সমগ্র জাতির প্রতীক।

দেশে অসংখ্য রাজনৈতিক দল। তাঁদের নানা আদর্শ, তাঁদের নানা পথ। তাঁদের মধ্যে মতান্তরের অন্ত নেই।

অনেকগুলি আবার অঞ্চল-ভিত্তিক দল।

পুরো দেশটায় তিন হাজারের মত দ্বীপ। আকারে সবচেয়ে বড় সুমাত্রা। কিন্তু জনসংখ্যায় জাভার তুলনা হয় না।

দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ জাভার অধিবাসী। জাভাতেই দেশের রাজধানী।

নানা অঞ্চলে জাভার আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটা প্রবল অসন্তোষ চলে আসছিল।

পি এন আই এবং পি কে আই, অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী ও কমিউনিস্টদলের বড় ঘাঁটি জাভা। এখানকার মানুষের উপর এই দুটি রাজনৈতিক দলের প্রভাব বেশী।

জাতীয়তাবাদী দল ভেঙে অনেকে কমিউনিস্ট দলে যোগ দিচ্ছেন। পি এন আই দল ভাঙছে আর পি কে আই দল ক্রমশ বড় হচ্ছে।

ইসলামী দল মাসজুমি পার্টির বড় ঘাঁটি সুমাত্রা দ্বীপে। ছোট বড় ব্যবসায়ী এবং গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের উপর এই দলের প্রভাব বেশী।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের দাবী নিয়ে জাকার্তার রাস্তায় রাস্তায় যখন বিক্ষোভ ফেটে পড়ছিল, মাসজুমি পার্টি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিসের সংঘর্ষ বাধে। কাঁদানে গ্যাস, গ্রেপ্তার ও জেল—পুলিসী ব্যবস্থা চরমে ওঠে।

সরকার থেকে তখন মাসজুমি পার্টি পদত্যাগ করেন। মন্ত্রিসভা থেকে তাঁরা বেরিয়ে আসেন।

তখন থেকেই সরকারের প্রবল সমালোচক মাসজুমি পার্টি। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ সম্পর্কেও তাঁদের কড়া অভিযোগ।

তাঁদের গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে সরকারের আরেক বিরুদ্ধবাদী সোসালিস্ট পার্টি। তাঁদের অভিযোগ, সুকর্ণ কমিউনিস্টদের প্রতি কোমল ভাবাপন্ন হয়ে দেশের চরম ক্ষতি করছেন।

পৃথিবীর নানা দেশে অনেকবার পরিভ্রমণ করেছেন সুকর্ণ। আমেরিকা গেছেন, ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভ্রমণ করেছেন। জাপানে গেছেন। সোভিয়েট রাশিয়া এবং কমিউনিস্ট চীন পরিভ্রমণ করেছেন।

সোভিয়েট রাশিয়া তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। বিপ্লবের পর শক্তিশালী রাজ্যগুলি রাশিয়ার শত্রুতা করেছিল।

দেশগঠনের জন্য খুব বেশী সময় পায় নি। সেই অল্প সময়ের মধ্যে প্রবল রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলারের নির্মম সৈন্যবাহিনী মস্কোর দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল।

রাশিয়ার পশ্চিমাংশ ওরা ভেঙে তছনছ করে দিয়েছিল। কলকারখানা, বাড়িঘর, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল প্রায় সব কিছু ধ্বংস হয়েছিল, ক্ষেতখামার জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু ধ্বংস করতে পারে নি জাতির তেজোদ্দীপ্ত স্বাধীনতার প্রেরণা।

পরাজিত হয়ে ওদের ফিরে যেতে হয়েছিল। নতজানু হয়ে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল প্রচণ্ড শক্তিশালী নাতসী সরকারকে।

হিটলার আত্মহত্যা করেছিলেন।

বিজয়ী হলেও রাশিয়ার সর্বত্র ছিল ধ্বংসলীলার সকরুণ চিহ্ন। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই সেই চিহ্নগুলি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। শুধু লুপ্ত নয়, তার জায়গায় গড়ে উঠেছিল অসাধারণ সমৃদ্ধি।

সোভিয়েট রাশিয়া এখন সমস্ত দিক থেকে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবল প্রতিদ্বন্দ্বী।

সোভিয়েট রাশিয়া পরিভ্রমণ করে এসে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ বলেছিলেন ঃ

সত্যিকারের উন্নত দেশের চেহারা শুধু বিশাল ইমারৎ আর রণশক্তির ওপরই ছায়া ফেলে না, দেশের সাধারণ মানুষের মুখ দেখলেও তা নির্ভুলভাবে বোঝা যায়।

সোভিয়েট রাশিয়ার মানুষদের মুখের চেহারায় হাসি আর খুশিতে সুখের ছাপ।

সাম্যবাদী চীন পরিভ্রমণ করেও প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

রাস্তার দু'দিকে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়েছিল হাজার হাজার ছেলে মেয়ে। তরুণ তরুণীরা হাত নেড়ে তাঁকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়েছিল।

চৌ-এন-লাই নিজে সঙ্গে করে তাঁকে কারখানা, নদীর উপর সেতু, ক্ষেতখামার দেখিয়েছিলেন।

মুগ্ধ হয়েছিলেন সুকর্ণ। বলেছিলেন, "আমি উত্তর খুঁজে পেয়েছি।"

সেই উত্তরই হচ্ছে তাঁর "নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের" ভিত্তি।

তিনি বলেছিলেন ইউরোপীয়ানদের কাছ থেকে আমরা যেমন অনেক কিছু পেয়েছি, তেমনি আবার ওরা অনেক কিছু ভুলও শিখিয়ে গেছে।

যেমন গণতন্ত্র।

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের বনিয়াদ হচ্ছে সংখ্যাধিক্য। শতকরা ৫১ জনের ভোট পেলেই আর কথা নেই; নির্বিচারে যা খুশি করে যাও।

সেখানে ৪৯ জনের মতামতের কোন দাম নেই।

তাছাড়া আবার এই একান্ন জনের মধ্যেও ভোটের নানা আজব কলা কৌশল থাকতে পারে।

আমাদের ফিরে যেতে হবে আমাদেরই প্রাচীন গণতন্ত্রের ঐতিহ্যে।

আগে আমাদের পল্লীতে পল্লীতে ছিল পঞ্চায়েতী শাসন।

গ্রামের বৃদ্ধরা একসঙ্গে মিলিত হয়ে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে সকলে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন।

অপরাধীদের সেইভাবে শাস্তি দেওয়া হত।

গ্রামের নিত্য শাসন-ব্যবস্থা সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলত।

ইন্দোনেশীয় ভাষায় গ্রামের এই পঞ্চায়েতী শাসন-ব্যবস্থাকে বলা হত 'গোতং রোয়ং'।

আমাদের সেই প্রাচীন 'গোতং রোয়ং' থেকেই শিক্ষা নিতে হবে।

সকলে মিলে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা দেশের শাসন কার্য চালিয়ে যাব।

শুধু একদল নয়, সর্ব দল। তাছাড়া শুধু রাজনৈতিক পার্টিই নয়; মিলিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সেই আসরে উপস্থিত থাকবেন বুদ্ধিজীবী, শ্রমজীবী, কৃষক, নারী—সকলে।

সেই সর্বজন সিদ্ধান্ত নিয়ে সুসমৃদ্ধ দেশ গঠন করতে হবে।

এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি গঠন করেছিলেন 'ন্যাশন্যাল কাউন্সিল'। এর সভাপতি ছিলেন প্রেসিডেন্ট স্বয়ং।

তিনি বলেছিলেন, কমিউনিস্টদেরও বাদ দিলে চলবে না। দেশের এক বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের উপর তাঁদের অসামান্য প্রভাব।

তাঁদেরও চাই।

প্রধান তিন দল আগেকার সরকার গঠনের সময় কিছুতেই কমিউনিস্টদের সঙ্গে নেন নি।

তাঁরা কমিউনিস্টদের ঘৃণা করেন; ওদের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলেন।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ এই ঘৃণা থেকে মুক্ত। তিনি দেশের সকলের 'ঐকমত্য' গঠনের আসরে কমিউনিস্টদেরও ডাক দিলেন।

ওদেরও সাড়া দিতে মুহূর্তের বিলম্ব হল না। ওরা এসে বসলেন ন্যাশল্যান কাউন্সিলের সভায়।

সরকারের অভ্যন্তরে কমিউনিস্টদের প্রাধান্য লাভের সেই সূত্রপাত।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন ক্রমশ দুভাগে বিভক্ত হয়ে যেতে লাগল।

সোভিয়েট শিবির।

চীনা শিবির।

সোভিয়েট শিবির সহ-অবস্থানের নীতিতে আস্থাশীল। বান্দুং শহরে অনুষ্ঠিত 'পঞ্চশীলের' ঐতিহাসিক শীর্ষ-নেতৃ প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সাম্যবাদী চীন।

ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার জওহরলাল নেহরু ও সুকর্ণ ছিলেন সেই সম্মেলনের দুই প্রধান স্তম্ভ।

'পঞ্চশীল' নীতির প্রধান নীতি ছিল পারস্পরিক সহ-অবস্থানের আদর্শ।

কিন্তু চীনা কমিউনিস্টরা আরো বৈপ্লবিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিল।

সহ-অবস্থানের নীতিকে ক্রমশ তারা ব্যঙ্গ করতে আরম্ভ করল।

সহ-অবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী বলে সোভিয়েট শিবিরকে চীনাদল 'শোধনবাদী' বলে আক্রমণ করতে থাকেন।

ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টি চীনা শিবিরের তালে তালে আন্তর্জাতিক জঙ্গীবাদের বিশ্বাসী হয়ে উঠে।

চীন হয়ে উঠে তাঁদের আদর্শ, বন্ধু ও নিয়ন্ত্রক।

ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির চীনের প্রতি এই প্রবল

অনুরক্তি ও সুদৃঢ় আনুগত্যের জন্য দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দল অত্যন্ত সন্দীহান হয়ে উঠেন।

কমিউনিস্ট পার্টির সততায় একমাত্র নিঃসন্দেহ ছিলেন প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ।

তখন থেকেই অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি অনুচ্চারিত সুরে ভাবতে আরম্ভ করে, প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ কি প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট ?

তাঁর নানা কাজে আর ঘরোয়া কথাবার্তায় এই সন্দেহটা ক্রমশ দৃঢ় হয়।

আবার অনেক সময় মনে হয়, এই সন্দেহটা একেবারেই অমূলক। নিতান্তই ভিত্তিহীন।

সুকর্ণ বিপ্লবের প্রতীক।

এই বিপ্লবের প্রেরণাই তাঁকে বিপ্লববাদী কমিউনিস্টদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সেতুবন্ধন করেছে।

আসলে তিনি 'ঐকমত্যের' সাধক।

কিন্তু একটা বিষয় স্পষ্ট, অন্যান্য রাজনৈতিক দল যখন প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের কাছ থেকে ক্রমশ সরে আসছে তখন একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি তাঁর কাছে আরো এগিয়ে চলেছে।

সুকর্ণের সমর্থনে কমিউনিস্ট পার্টির সভা, শোভাযাত্রা, পুস্তিকা, সংবাদপত্র সবসময়ই সরব।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে স্পোর্টস স্টেডিয়ামে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের ভাষণেরও দৃঢ় সমর্থক কমিউনিস্ট পার্টি।

জাতির কাছে সেদিন ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ।

সভা আরম্ভ হবার অনেক আগে থেকেই তিল ধারণের আর জায়গা ছিল না।

ড্রাম বাজিয়ে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে অসংখ্য সারিবদ্ধ মিছিল এসে পৌঁছেছিল সভাক্ষেত্রে।

শ্রোতাদের উত্তেজনা আর উদ্দীপনার অন্ত ছিল না।

তুমুল করতালির মধ্যে মঞ্চে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ। তাঁর মুখে হাসি, চোখে উজ্জ্বল দৃষ্টি।

সতেজ কণ্ঠে তিনি এক তেজোদৃপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন :

জাতিসংঘ যদি অবিলম্বে পশ্চিম ইরিয়ান থেকে ওলন্দাজদের বিতাড়িত না করে, তাহলে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার আন্দোলন পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে দেবে। পশ্চিম ইরিয়ান ইন্দোনেশিয়ার অংশ—ওলন্দাজদের হাত থেকে দেশের এই অবিচ্ছেদ্য অংশকে সত্বর মুক্ত করতে হবে। ওলন্দাজরা যদি হটতে রাজী না হয়, তাহলে ইন্দোনেশিয়ার বীর মুক্তি-যোদ্ধারা প্রাণ দিয়ে এই হঠকারিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। পশ্চিম ইরিয়ানের মুক্তি জগতের কোন শক্তিই রোধ করতে পারবে না। দেশের একটি অংশের মুক্তির জন্য সমগ্র জাতি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করবে। এই মুক্তিযুদ্ধের জন্য যে কোন প্রকার কষ্ট স্বীকার করতে জাতি মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করবে না!

সভার সকল শ্রোতা উচ্চকণ্ঠে এই ঘোষণা সমর্থন করেছিল। ড্রাম বেজে উঠল, শুরু হয়ে গেল সমবেত রণসঙ্গীত।

সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

শ্রোতাদের রক্তস্রোতে শিহরণ, প্রাণের মধ্যে এক অপূর্ব চাঞ্চল্য।

গঠিত হল 'পশ্চিম ইরিয়ান মুক্তি কমিটি'। হাজার হাজার যুবক স্বেচ্ছাব্রতীর তালিকায় নাম লেখালেন।

পশ্চিম ইরিয়ানের মুক্তিই তখন সমগ্র জাতির একমাত্র লক্ষ্য।

প্রেসিডেণ্টের আরেকটি ঘোষণায় মাসজুমি পার্টি ও সোসালিস্ট বেআইনী ঘোষিত হল।

॥ দশ ॥

পশ্চিম ইরিয়ান মুক্তি কমিটির আন্দোলনে দুই ভাই এই প্রথম পাশাপাশি এসে দাঁড়াল।

লেঃ কর্ণেল জাহির। আর—

কমরেড শাহির।

পরাধীনতার আমলে স্বাধীনতার স্বপ্নে উদ্বেল জাতীয়তাবাদী, আদর্শে সমাজতান্ত্রিক, ডঃ হুসেনের দুই ছেলে।

জাতির প্রাণ-ব্রতে উদ্বুদ্ধ দুই যুবক, অথচ তাদের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ।

পারস্পরিক সন্দেহ ও ঘৃণার একটি অন্যতম অব্যর্থ কারণ নিশ্চয়ই লখমি।

কিন্তু দুই জনের দুই আদর্শ এবং এই আদর্শের তীব্রতা আরো গভীরতর পার্থক্য সৃষ্টি করেছে।

তথাপি প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের আহ্বানে দুই জন এক শিবিরে মিলিত হয়েছে।

উপলক্ষ্য পশ্চিম ইরিয়ানের মুক্তিযুদ্ধ।

শুধু দুই ভাই নয়; দেশের দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। সামরিক বাহিনী আর কমিউনিস্ট পার্টি।

সমগ্র রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রগতি সবচেয়ে বিস্ময়কর।

সুকর্ণ প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী দল পি এন আই ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতির তীব্র মনোভাবের প্রতিফলন।

এই দলের অর্থনৈতিক আদর্শ ছিল, ওলন্দাজ ও চীনাদের আধিপত্য ধ্বংস করে জাতীয় অর্থনীতিকে বিকশিত করা।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গঠনে এই দল ছিল নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র-নীতির সমর্থক।

ওলন্দাজ শক্তিকে বিদায় দেবার পর এই দলের প্রভাব আস্তে আস্তে কমতে শুরু করে।

দ্বিতীয় প্রধান দল মাসজুমি পার্টির নেতৃত্ব করতেন শিক্ষিত ও মুসলিমবাদী এক প্রভাবশালী সম্প্রদায়।

দলের মুখ্য নেতা মহম্মদ নাসির।

জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া ইসলাম শরিয়তী আদর্শে শাসিত হউক, এই ছিল এই দলের কাম্য।

কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী।

সুকর্ণের মা ছিলেন বালির হিন্দু রমণী। সুকর্ণ স্বয়ং যদিও গোঁড়া মুসলমান, তথাপি তিনি মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্ম নিয়ে গঠিত সমগ্র ইন্দোনেশিয়ান জাতিতে বিশ্বাসী।

সংখ্যায় বৃহত্তম হলেও একমাত্র মুসলমানদেরই প্রাধান্য দিতে তিনি অস্বীকৃত।

মাসজুমি পার্টির প্রধান ঘাঁটি সুমাত্রা দ্বীপে। এই পার্টি জাভার আধিপত্য সম্পর্কে অত্যন্ত বেশী সচেতন।

এ নিয়ে তাঁদের সরব প্রতিবাদের অন্ত নেই। আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্ব শাসনের অধিকার নিয়ে তাঁরা কঠোর আন্দোলনে নামতেও দ্বিধা করেন নি।

জাভাতেও এই পার্টির ঘাঁটি ছিল, কিন্তু তা নিতান্তই সুদানী মুসলমানদের অধ্যুষিত দক্ষিণ-প্রান্তীয় জাভা।

গোঁড়া মুসলমানদের আরেকটি বড় পার্টি 'নাহদাতুন উলামা' সংক্ষেপে 'নু' (এন ইউ)।

মৌলানা আর মৌলবীদের নেতৃত্বে পরিচালিত এই পার্টির প্রভাব গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মুসলমান জনসাধারণের উপরই বেশী।

সারা দেশের গ্রামে গ্রামে অসংখ্য মসজিদ। শহরগুলির কেন্দ্রস্থানেও বিরাট মসজিদের সংখ্যা অনেক।

লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে পাঁচ হক্ত নামাজ পড়েন। তাদের উপর মৌলানা মৌলভীদের প্রভাব অপরিসীম।

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর সোসালিস্ট পার্টির প্রতিপত্তি ছিল প্রচুর। শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবীদের উপর এই পার্টির আবেদন ছিল।

কিন্তু প্রথম নির্বাচনে সোসালিস্ট দল একেবারেই নির্মূল হয়ে গেছে। তাঁদের ভাগ্যে একটি আসনও জোটে নি।

জনসাধারণের কাছ থেকে ক্রমশ এই দল একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

সোসালিস্ট দলের আর কোন ভবিষ্যৎ নেই ইন্দোনেশিয়ায়।

অন্যান্য দলগুলিও যেন ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ছে।

রাজনৈতিক দলগুলির আধিপত্য ও প্রতিষ্ঠা পার্লামেন্টেই সব থেকে বেশী। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সুপ্রিম অ্যাডভাইসরি বোর্ড গঠন করার পর পার্লামেন্টের ক্ষমতাও বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির দীপ্তিও নিষ্প্রভ হতে চলেছে।

প্রশাসনিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারের প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সুপ্রিম অ্যাডভাইসরি বোর্ড।

এই বোর্ডে কমিউনিস্টদের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি জনসাধারণের উপরই সবচেয়ে বেশী। পার্টির সংগঠন ক্ষমতাও অসাধারণ। কর্মীগণের আনুগত্য, কর্মদক্ষতা ও প্রচার কৌশল ঈর্ষাযোগ্য।

দিনের পর দিন কমিউনিস্ট পার্টি স্ফীত হচ্ছে। এই পার্টির বিশাল ছায়া পড়েছে সারা দেশের উপর।

প্রেসিডেন্ট সুকর্ণও কি এই পার্টির অসামান্য জনসমাবেশ করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করছেন?

অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একটা কুটিল সংশয় ক্রমশ দানাবদ্ধ হচ্ছে।

কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি নিজেদের উপর দারুণ আস্থাশীল। তাদের একমাত্র আশঙ্কা সামরিক বাহিনী।

একদিন এই বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। ক্ষমতা লাভের জন্য সেই হবে শেষ পাঞ্জা লড়াই।

১৯৫৬ সালেও সামরিক বাহিনী ছিল বিযুক্ত।

সারা দেশটি ছিল সাতটি সামরিক অঞ্চলে বিভক্ত। সুমাত্রায় ছিল দুইটি, জাভায় তিনটি, একটি বোর্নিও'তে এবং একটি ছিল পূর্বাঞ্চলের দ্বীপপুঞ্জে।

একটি অঞ্চলের সঙ্গে আরেকটি অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল সামান্য। কেন্দ্রীয় সামরিক সংস্থার ক্ষমতাও ছিল সামান্য।

আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনীর মূল আনুগত্য ছিল আঞ্চলিক প্রধানের প্রতি; জাকার্তার আঞ্চলিক সেনাপতি দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী রোজলান আব্দুল গণিকে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিলেন। প্রধান মন্ত্রী আলি শাস্ত্রোমিদজোজো এর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপেই কেবল তাঁকে মুক্তিদান করা হয়েছিল।

আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী অনেকটা স্বাধীন ভাবেই কাজকর্ম করত।

তার ফলে অনেকবারই আঞ্চলিক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। কর্নেল জুলকিফি জাকার্তার শাসকদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। লেঃ কর্নেল হুসেন সুমাত্রায় ঠিক একই কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন।

পশ্চিম সুমাত্রায় তো 'ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের বৈপ্লবিক সরকার' (পি আর আর আই) গঠনের ঘোষণা দেশবিদেশে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল।

কিন্তু পশ্চিম ইরিয়ানের মুক্তি সংগ্রাম দেশের সামরিক বাহিনীকে সুসংবদ্ধ করার প্রেরণা জুগিয়েছে।

প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, তাঁর ক্ষমতার প্রত্যক্ষ ভিত্তিও এই সামরিক বাহিনী।

সমগ্র দেশের সামনে এখন একটি মাত্র লক্ষ্য, পশ্চিম ইরিয়ানের মুক্তি।

কমিউনিস্ট পার্টি ও সামরিক বাহিনী এখন এই আশু লক্ষ্যে শুধু সমীপবর্তী নয়, একলগ্ন।

তথাপি দুই ভাই লেঃ কর্নেল জাহির এবং কমরেড শাহিরের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কথাবার্তা বন্ধ।

॥ এগারো ॥

শহরতলীর পৈত্রিক বিরাট বাড়ি ছেড়ে এখন শাহির উঠে এসেছে কমরেডদের একটি ছোট 'কমিউনে'।

'কমিউন' মানে ছোট বাড়ি। পার্টি সদস্য আর সক্রিয় সমর্থকরাই এখানে থাকতে পারে। নিজেরাই রান্না বান্না, সাফসুরোত ইত্যাদি সাংসারিক যাবতীয় কাজ করে নেয়।

এখানে থাকার একটি সুবিধা এই, সকলেই এক মতাবলম্বী। পার্টি আর পার্টি-নির্দেশিত পথে দেশের কল্যাণ চিন্তাই সকলকে একসূত্রে বেঁধে রাখে।

ছোট্ট ছিমছাম একটি দোতলা বাড়িতে ঘরের সংখ্যা ছয়, বাসিন্দার সংখ্যা ষোল।

এক একটি ঘরে তিনজন কমরেড থাকে। শুধু একা একটি ঘরে থাকেন সফরুদ্দীন সাহেব। তিনি পার্টির মস্ত নেতা, সারা ইন্দোনেশিয়ার এঞ্জিনীয়ারিং শিল্পসংস্থার শ্রমিক ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট।

তাঁর ঘর বোঝাই কাগজপত্র আর বই। রোজই ঘরে এ-ইউনিয়ন আর ঐ-ইউনিয়ন কর্মীদের সভা লেগেই রয়েছে। তাঁকে একা একটি ঘর না দিলে চলে না।

শাহির অত উঁচু-দরের নেতা না হলেও, সারা দেশে তার নামডাক কম নেই। তার কর্মক্ষেত্র ছাত্র ও যুব সমাজ।

পার্টির দৈনিক সংবাদপত্রেও প্রায়ই প্রবন্ধ লিখতে হয় শাহিরকে। তার বইপত্র এবং নানা ধরনের ফাইলের সংখ্যাও কম নয়।

তবু এখানেই বেশ আছে শাহির।

সমধর্মী বলে সকলেই পরস্পরের প্রতি খুব সহানুভূতি-সম্পন্ন। অসুখে-বিসুখে বিপদে-আপদে সকলেই সমানভাবে এগিয়ে আসে। (অনেক সময় শাহিরের মনে হয়, নিছক রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়দের তুলনায় অন্তরঙ্গ বন্ধুরা অনেক বেশী মূল্যবান।)

আর পার্টির পতাকাতলে এক চিন্তা, এক আদর্শ, এক ব্রতের মধ্য দিয়ে যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, তা তো ইস্পাতের মত দৃঢ়।

দাদা জাহিরকে সে প্রাণপণে ভুলে যেতে চায়। অথচ নানা চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে তার আনাগোনা কিছুতেই রোধ করতে পারে না।

এক পিতা ও এক জননীর দুই সন্তান—আপন সহোদর ভাই। অথচ তার সঙ্গে দাদা জাহিরের মত শত্রুতা আর কে করেছে?

লখমি? বজ্ররেখার মত হঠাৎ ঝলসে উঠে একটি লাবণ্যময়ী, মনোরমা মুখশ্রী।

হঠাৎ শাহির বুকে হাত রেখে দাঁতে দাঁত চেপে শ্বাস রোধ করে নিজেকে যেন চাবুকের ঘা মারে—না, আর নয়।

স্মৃতি নয়, জীবনকে ভবিষ্যতের দিকে দ্রুতবেগে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কিছুতেই ফেলে আসা দিনের কোন কোমল অনুভূতির রোমান্টিকতায় অশ্রুসিক্ত, শ্রম-অলস ও আত্মসর্বস্ব করে তুলবে না।

ওগুলো তো বুর্জোয়া চিন্তাধারার কদাকার শৃঙ্খল। ওগুলো নির্মম কুঠারাঘাতে ভাঙতে হবে।

তার জীবন কঠোর পরিশ্রমী কমিউনিস্টের জীবন। সামনে অসংখ্য কাজ ও দায়িত্ব। তার এখন স্বপ্ন দেশের অপার সমৃদ্ধি ও যথার্থ মুক্তি।

একটি বিশ্বাসঘাতিনী নারীর কাছ থেকে পাওয়া মর্মন্তুদ যন্ত্রণা তার এগিয়ে চলা জীবনরথকে কিছুতেই স্তব্ধ করে দিতে পারবে না।

'কমরেড?'

চমকে উঠল শাহির। তাকিয়ে দেখল একটি মেয়ে, হাতে বইপত্র, সম্ভবত কলেজের ছাত্রী। তার দিকেই উন্মুখ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

ঘরে আর কেউ নেই।

সম্প্রতি প্রকাশিত এক কমিউনিস্ট কবির লেখা এক কাব্যগ্রন্থ নিয়ে সে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল।

আজ তাকে বইটির সমালোচনা লিখে দিতে হবে। কিন্তু পড়তে পড়তে ব্যক্তিগত নানা গভীর অনুভূতির দোলায় সে যে কখন দোদুল্যমান হয়ে পড়েছে, খেয়াল নেই।

এবার সপ্রতিভ হয়ে বলল, বলুন।

আমার নাম রজিয়া। ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। আপনি সেদিনের সিম্পোসিয়ামে এমন চমৎকার বলেছিলেন, আমার অদ্ভুত ভাল লেগেছিল।

মেয়েটি লাজুক হাসি হেসে মাথা নিচু করল। তারপর বলল, আপনাকে অভিনন্দন জানাতে এলাম।

বেশ তো। কিন্তু এত কষ্ট করার কী দরকার ছিল? আমি তো রোজই নানাজায়গায় কত কথাই বলি।

হ্যাঁ বলেন। আপনার অনেক বক্তৃতা আমি শুনেছি। কিছু কিছু লেখাও পড়েছি। সবই আমাকে মুগ্ধ করে।

মেয়েটির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল শাহির। মেয়েটি কী গোয়েন্দা নাকি পার্টি-দরদী?

দেখতে ছিমছাম চেহারা। নাকটা চীনাদের মত একটু থ্যাবড়া, চোখের বর্ণও পিঙ্গল। গায়ের রং হয়ত উজ্জ্বল শ্যাম, কিন্তু নতুন যৌবনের জোয়ার সারা শরীরে, লাবণ্যের প্রখর দীপ্তি।

আর চোখের তারায় গভীর অতলতার ছায়া।

আপনার কাছে একটা বিশেষ অনুরোধ নিয়ে এসেছি। আপনি কিন্তু নিরাশ করবেন না।

মেয়েটি বিনীত অনুরোধ জানাল।

হাসল শাহির। বলল, আগে বলুন অনুরোধটা কী?

আমি এনসেণ্ট হিস্টরির ছাত্রী। আমাদের ক্লাসে একটা ডিবেটিং ক্লাব আছে। আগামী সোমবার আমাদের ডিবেট হবে। বিষয়ঃ ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পক্ষে প্রাচীন ঐতিহ্য ভার বিশেষ। আপনাকে এই সভায় সভাপতিত্ব করতে হবে।

আবার হাসল শাহির।—ঐতিহ্য ভারবিশেষ? বলেন কী? ঐতিহ্য না থাকলে আমাদের বর্তমান তো মূল্যহীন, ভবিষ্যৎ তো অন্ধ।

এ সব নিয়েই তো ডিবেট হবে।

কিন্তু সোমবার? মাত্র তিনটে দিন মাঝখানে। আচ্ছা ডায়রিটা দেখছি।

হ্যাঙ্গারে ঝোলান কোটের পকেট থেকে ডায়রিটা বার করল শাহির। দ্রুত হাতে তারিখ বার করে পাতাটা দেখল। সেদিন একটাই মাত্র এনগেজমেণ্ট, সন্ধ্যা সাতটায় স্টুডেণ্টস ম্যাগাজিনের একজিকিউটিভ কমিটির সভা।

আপনাদের মিটিং কখন?

বিকেল তিনটেয়।

আবার ভাল করে ভেবে নিল শাহির। বলল, বেশ, আমি লিখে নিচ্ছি। কিন্তু ছ'টার মধ্যে আমাকে বেরোতেই হবে।

তাই হবে। খুশি খুশি গলায় বলল মেয়েটি।

—আমরা আপনার কাছ থেকে শিখতে চাই।

শেখা? আমি কী শেখাব? আমি নিজেই এখন পর্যন্ত শিখছি।

আমরা তো অনেক ছোট। আপনার আলোচনা আমাদের আলো দেখাবে। এটাই বলতে চাইছিলাম।

দেখাবে কিনা আমি কী জানি? আপনারাই দেখবেন।

শাহিরের কণ্ঠস্বর একটু কঠোর শোনাল। সে বুঝতে পারল, মেয়েটি পুরোপুরি কমিউনিস্ট হতে পারে নি। বুর্জোয়া ভাবালুতা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, এদের মধ্যেই তো কাজ করতে হবে বেশী।

বুর্জোয়া চিন্তাধারা থেকে মুক্ত করে এদের নতুন পথ দেখাতে হবে। পার্টিকে বৃহত্তম জনতার মধ্যে সংঘবদ্ধ করতে হবে। বলল, সোমবার আমি তিনটেয় যাব।

মেয়েটি বুঝল এটি ওঠার ইঙ্গিত।

বইগুলি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। বলল, আপনার অনেক কাজের সময় নষ্ট করলাম।

শাহির হাসল খুব মোলায়েমভাবে। বলল, এই তো আমার কাজ। আপনাদের নিয়েই আমার কাজের জগৎ। কাজেই সময় নষ্ট হয়েছে ভাববেন না।

আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

মেয়েটি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার কবিতার বইয়ে মন দিল শাহির। শব্দের পর শব্দের সঙ্গে ছন্দের দোলা মিশিয়ে কবিতার রাজ্য এক অদ্ভুত অনুভূতির জগৎ।

কমিউনিস্ট কবির লেখা তাই ছত্রে ছত্রে বিদ্রোহের জোয়ার আর ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা।

শাহির ভাবতে লাগল।

একশ বছর আগে মার্ক্স ও এঙ্গেলস কমিউনিস্ট চিন্তাধারা সারা ইউরোপে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তখন সারা পৃথিবীর প্রতিক্রীয়াশীলরা এই ভাবধারাকে ধ্বংস করে দেবার চেষ্টায় হাত মিলিয়েছিল।

কিন্তু তাদের স্বপ্ন সফল হয় নি।

শুধু তাই নয়, ধ্বংস করা দূরে থাকুক কমিউনিজমের ভাবধারাকে ওরা ঠেকিয়ে রাখতেও পারে নি।

কমিউনিজমের ভাবধারা ক্রমাগত বিজয়ের পথে এগিয়ে চলেছে।

আজ একশ বছর পরে এই ভাবধারা সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে মুক্তি দিয়েছে।

তাদের নতুন সমাজতান্ত্রিক দেশ গঠনের পথে পরিচালিত ও নেতৃত্ব করেছে।

এই চিন্তাপ্রবাহ এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনসাধারণকে স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামে প্রবল উৎসাহ দিয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার শ্রমজীবী জনসাধারণের সংগ্রামে দেশের পরিস্থিতি অনুসারে চল্লিশ বছর আগে এদেশে কমিউনিস্ট পার্টি জন্মগ্রহণ করেছিল।

১৯১৭ সালের আগে পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্টরা সোস্যাল ডেমোক্রেটিক সংস্থার মধ্যে কাজ করতেন। কিন্তু লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট ইউনিয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখে তাঁরা দেশকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিজেদের সোস্যাল ডেমোক্রেটিক সংস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ পি. কে. আই. প্রতিষ্ঠা করেন।

তখন থেকেই দলের একক যাত্রা।

ডাচ দস্যুরা এই পার্টিকে নিশ্চিহ্ন করার কোন অপচেষ্টাই বাদ রাখে নি।

পার্টি বেআইনী ঘোষণা করেছে, নেতা ও কর্মীদের জেলে পুরেছে, সমর্থকদের প্রতি নানা উৎপীড়ন চালিয়েছে।

কিন্তু ধ্বংস হওয়া দূরের কথা, পার্টি দিনের পর দিন আরো সংঘবদ্ধ, আরো শক্তিশালী হয়েছে। শুধু বাইরের শত্রু নয়, পার্টির ভেতরেও শত্রুদের সঙ্গে অনবরত সংগ্রামের ফলে বারে বারে সংকট ও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

ডাচদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল জাপানী সাম্রাজ্যবাদী জঙ্গী শক্তি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষার্ধে নাৎসী হিটলারের সহযোগী জাপান যখন ইন্দোনেশিয়ায় নেমে পড়ে এবং ডাচদের বিতাড়িত করে দেয় তখন দেশের অনেকেই উল্লসিত হয়েছিল। কিন্তু কমিউনিস্টরা হয় নি।

কমিউনিস্টরা গেরিলা যুদ্ধের আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী নেয়। শুধু দৃষ্টিভঙ্গী নয়, প্রকৃতপক্ষে গেরিলা যুদ্ধ চালায়।

জাপানীরাও কমিউনিস্টদের ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাতে সফল হয় নি।

শাহির ইতিহাসের কথা ভাবছিল।

রজিয়ার প্রাচীন ইতিহাস নয়। সাম্প্রতিক ইতিহাস।

১৯২৬ সালে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ডাচ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটেছিল।

অবশ্য তা ব্যর্থ হয়েছিল।

তা ব্যর্থ হবার নানা বাস্তব কারণ রয়েছে। দেশের জনসাধারণ তখনও বিপ্লবের জন্য যথার্থ প্রস্তুত হতে পারে নি।

তাছাড়া দেশের অভ্যন্তরে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার শক্তি এবং দরিদ্র, অশিক্ষিত, মূঢ় জনসাধারণের প্রভুভক্তিও ছিল অটুট। কমিউনিস্ট পার্টি তখনও জনসাধারণের মোহভঙ্গ করতে পারে নি।

তথাপি নৈরাশ্যের অন্ধকারকে করাতের আঘাতে দীর্ণ করার জন্য বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল।

তা যে ব্যর্থ হবে তা সবারই জানা। অথচ দেশের মধ্যে অটুট অটল যে জড়তা স্থাণুবৎ নিশ্চল হয়েছিল, তাকে ভাঙতে না পারলে অগ্রগতি ত্বরান্বিত হচ্ছিল না।

দেশের জনসাধারণের মধ্যে নতুন আশা, নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করার জন্য সংগ্রামের প্রয়োজন ছিল।

ডাচ শক্তি বেপরোয়া রূঢ়তার সঙ্গে তা ব্যর্থ করে দিয়ে কমিউনিস্টদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়।

কিন্তু তাতে কী ধ্বংস হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি ?

না।

পার্টি বেঁচে থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচরদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে গেছে।

১৯৩৫ সালে আবার ডাচ শাসনশক্তি কমিউনিস্টদের উপর আক্রমণ চালায়। যাঁরা গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা ফ্যাসীবিরোধী ফ্রন্টের অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের সহযোগিতায় সংগ্রাম চালাতেই থাকেন।

শোষণের শাসন যতদিন চলবে এ সংগ্রামের কোনদিন ক্ষান্তি হবার নয়।

জাপানী ফ্যাসিস্টদের সামরিক দখলে থাকার ফলে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি আবার শত্রুর মুখে পড়ে।

পার্টির শ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা যুদ্ধে নিহত হন। তাঁদের বীরত্বের ইতিহাস ভবিষ্যতের উদ্দীপনা।

বাকি যাঁরা বেঁচে ছিলেন সেই সব কমিউনিস্ট নেতা কর্মী ফ্যাসিস্ট বিরোধী দেশপ্রেমিক শক্তির সঙ্গে আন্তরিক সহযোগিতায় জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগস্ট তারিখে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণাকে কার্যকরী করে তোলেন।

পরে তাঁরা ডাচ সাম্রাজ্যবাদীদের পুনরাগমনের পর তরুণ স্বাধীন ইন্দোনেশীয় রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক শক্তির প্রতিভূ হাতা সরকার ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে আবার এক নতুন সন্ত্রাসের অধ্যায় আরম্ভ করেন।

দেশের প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি কমিউনিস্ট পার্টিকে কখনো পছন্দ করে নি। এমন কি আন্তরিক ঘৃণা করে এসেছে। এর পুরো

সুযোগ নিয়ে হাতা সরকার কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের রথ চালিয়ে দেন।

পার্টির প্রধান নেতৃবৃন্দ মৃত্যুবরণ করেন।

তথাপি পার্টি দেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

পার্টি আবার উঠে দাঁড়ায় এবং দ্রুত শক্তিবৃদ্ধি করতে থাকে। ক্রমশ জনসাধারণের উপর প্রবল প্রভাব ফেলে ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

১৯৫১ সালে প্রতিক্রিয়াশীল সুকিমান সরকার আবার ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে আরেকটি রক্তাক্ত সন্ত্রাস আরম্ভ করেন।

কিন্তু তাও ব্যর্থ হয়েছে।

কমিউনিস্ট পার্টি শুধু কেন্দ্রীয়ভাবেই আক্রান্ত হয় নি। তার স্থানীয় সংস্থাগুলিও গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তথাপি এত আক্রমণ, এত নির্যাতন সত্ত্বেও গত দশ বছরের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার ভেতর দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে।

লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত ও ছাত্র কমিউনিস্ট ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছে।

আজ শুধু পার্টির সদস্য সংখ্যাই ত্রিশ লক্ষের উপর। দরদী ও সমর্থকদের সংখ্যা যে কত বিশাল, তা তো সহজেই অনুমেয়।

সুধু হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির জনপ্রিয়তা আজ ইন্দোনেশিয়ার একটি বাস্তব সত্য।

তাই জমিদার ও শিল্পপতি আর তাদের বংশবদ অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি আতংকিত হয়ে পড়েছে তারা প্রায় মরীয়া হয়ে উঠেছে।

তাদেরই কিছু সংখ্যক ছদ্মবেশী অনুচর পার্টির মধ্যেও ঢুকে পড়েছে। অত্যন্ত শঠ ও কুচক্রী ওরা। দলের মধ্যে ঢুকে বিভেদ ও চিন্তাধারায় ভ্রান্তি করার জন্য ওদের চেষ্টার অন্ত নেই।

যারা শত্রু তাদের সহজেই চেনা যায়। কিন্তু যারা মিত্রতা ও আত্মীয়তার ভেক ধরে সর্বনাশ করার মতলব আঁটে, তাদের মত ভয়াবহ আর কিছু নেই।

ওরাই পার্টিকে নব্য রাশিয়ার ক্রুশ্চেফীয় সংশোধনবাদের দিকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। বিপ্লবের পথ থেকে সরিয়ে পার্লামেন্টারী ও শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ক্ষমতা করায়ত্ত করার স্বপ্নজাল বুনছে।

ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনে একমাত্র চীন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বই স্বীকার করে।

শাহির বইটা বন্ধ করে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। নীল আকাশের গায়ে শরৎকালের পুঞ্জ পুঞ্জ শাদা মেঘের ভেলা আস্তে আস্তে ভেসে যাচ্ছে।

রাস্তায় যানবাহন চলাচলের আওয়াজ। অসংখ্য পথচারী ব্যস্ত হয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

কয়েকটি খুশি-খুশি বালিকার একটি দল বুকে বই চাপা দিয়ে স্কুলে যাচ্ছে।

শাহির জানালার কাছ থেকে সরে এসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বারোয়ারী ইজিচেয়ারে আরাম করে বসল।

প্রাচীন ইতিহাসের ছাত্রী রজিয়ার চেহারাটা মনের আয়নায় ভেসে উঠল। বিতর্ক সভা। ঐতিহ্যের অবদান আর ভবিষ্যতের আহ্বান!

বিষয়টা ওরা মন্দ বাছাই করে নি।

যেকোন বিষয় নিয়ে অনেকক্ষণ বলার মত ক্ষমতা আছে শাহিরের। প্রতিটি কথার প্রতি শ্রোতাদের তীক্ষ্ম মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখার যাদুও তার জানা।

তথাপি প্রশ্নটা নিয়ে নিজের মনেই আলোচনা শুরু করল।

যেন আজই তাকে বক্তৃতা দিতে হবে।

হঠাৎ একটা কথা মনে হল শাহিরের। প্রত্যেক মানুষই এক-একটা বিশেষ বৃত্তির জন্য জন্মগত স্বভাব থেকে পারদর্শী হয়ে ওঠে।

অবশ্য সেই বৃত্তিতে চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করার জন্য একনিষ্ঠ অনুশীলনও প্রয়োজন।

বাচ্চা বয়স থেকেই রাজনীতির প্রতি একটা প্রবল ঝোঁক ছিল শাহিরের। ইতিহাস পড়েছে, রাজনীতির বিস্তর বই অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে শেষ করেছে

কখন যে বক্তৃতা দেবার অভ্যাসটাও আয়ত্ত হয়ে গেছে খেয়াল ছিল না। পড়াশোনার পরই তার আকর্ষণ ছিল বিতর্ক সভার উত্তেজনার প্রতি।

যে কোন একটা বিষয় নিয়ে প্রতিপক্ষকে তর্কযুদ্ধে নাস্তানাবুদ করা থেকে মজার খেলা সে আর খুঁজে পায় নি।

সাজ্জাদ ছিল স্কুল কলেজের বন্ধু।

চমৎকার লিখত সাজ্জাদ। কথার পর কথা সাজিয়ে পাতার পর পাতা লিখে যেত অবলীলাক্রমে।

কিন্তু মুখে কথা সরত না।

মুখচোরা লাজুক স্বভাব ছিল তার। কলেজে রেকর্ড নম্বর পেয়ে সোনার মেডেল নিয়ে পাশ করেছিল।

কলেজের অধ্যাপনার কাজ জুটিয়ে নিতে তার দেরী হয় নি। অথচ কলেজে পড়ানো বা বক্তৃতা দেওয়া সাজ্জাদ ভাল পারে না।

জীবিকায় সে সফল হতে পারে নি।

অথচ সারা ইন্দোনেশিয়ায় তার মত এমন বিখ্যাত সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ লেখক ও সমালোচক আর দ্বিতীয় নেই।

সাজ্জাদ লেখক হওয়া ছাড়া আর কিছুতেই বড় হতে পারে না। শাহির বক্তৃতামঞ্চে কথার পৃষ্ঠে কথা উচ্চারণ করে তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে।

কিন্তু কাগজ কলম এনে দাও, বড় কষ্ট তার। কোনক্রমে

একটা লেখা দাঁড় করাতে হয়ত পারে, কিন্তু তাতে উচ্চারিত কথার যাদু ছড়িয়ে দিতে জানে না।

শুধু সাজ্জাদ কেন?

তার দাদা জাহির। সেও ওই সাময়িক কাজেরই যোগ্য মানুষ। শুধু মিলিটারী কলেজেই নামী ছাত্র ছিল না, চরিত্র ও মেজাজের দিক থেকেও সে ওই বিষয়েরই উপযুক্ত।

মনে পড়ল শাহিরের, লখমি বি. এ. পাশ করার পর অনেকদিন ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্সে সেলসগার্ল ছিল।

অমন হাসিখুশি, সুন্দরী ও কথাবার্তায় চৌখস মেয়ে সেলস-গার্ল হিসেবে যে সাফল্য লাভ করবে, তাতে অবাক হবার কি আছে?

প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে এক বিস্ময়কর ছাত্র ছিলেন।

রেকর্ড নম্বর পেয়ে পাশ করার পর অনেকগুলো ডাচ কম্পানি থেকে তিনি এঞ্জিনীয়ারের চাকরির প্রস্তাব পান। লোভনীয় সব চাকরি।

কিন্তু একটাও তিনি গ্রহণ করেন নি।

তিনিও বাচ্চা বয়স থেকে নিজেকে রাজনীতির জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। শিক্ষাজীবন শেষ করার পর রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করে নিয়েছিলেন।

একটি মানুষ, একটি নতুন জাগ্রত জাতির নায়ক।

বাইরের রাস্তায় একটা তুমুল বিস্ফোরণের শব্দ শুনে একটু চমকে উঠল শাহির।

ছুটে এসে দাঁড়াল জানালায়।

একটা মিলিটারী ট্রাক ঘিরে অনেক লোক জমে গেছে। রাস্তায় যানবাহনের স্রোত বন্ধ।

কিছু লোক এদিক ওদিক ছুটে পালাচ্ছে!

কি ব্যাপার ?

মনোযোগ নিয়ে দেখতে লাগল শাহির। কেউ বোধহয় একটা পটকা ছুঁড়েছে। মনে হচ্ছে কেউ আহত হয় নি। কোন গুরুতর কাণ্ড ঘটে নি।

কিন্তু হঠাৎ পটকা ?

একি সামরিক বাহিনীর প্রতি জনসাধারণের বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ?

হওয়াটা বিস্ময়কর নয়।

পশ্চিম ইরিয়ান নিয়ে সমগ্র জাতির উদ্দীপনা যখন টগবগ করে ফুটছে ঠিক সেই সময়ই সামরিক বাহিনীর একটি প্রভাবশালী অংশ সুমাত্রায় আবার বিদ্রোহ করেছে।

ওরা কেন্দ্রীয় শাসকদলের রদবদল চান।

স্বাধীনতা লাভের পর অনেকবারই সামরিক বাহিনীর নানা অঞ্চলে ছড়ান নেতারা বিদ্রোহ করেছেন।

প্রায় কোন বছরই সেনাপতিদের এই বিদ্রোহ থেকে সুমাত্রা রেহাই পায় নি।

কিন্তু ঠিক এ সময় ? যখন সমগ্র জাতি সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে রত, তখনই কি ভ্রাতৃঘাতী বিদ্রোহের অবকাশ ঘটল ?

সামরিক বাহিনী দেশের আত্মরক্ষার অত্যাবশ্যক অঙ্গ। কিন্তু সামরিক বাহিনীর প্রধান যাঁরা, তাঁরা অধিকাংশই দেশের রক্ষণশীল সামন্ততান্ত্রিক শক্তির প্রতিভূ।

তাই দেশের রক্ষণকার্যের উপরও তাঁরা শাসনতান্ত্রিক আদর্শ ও রীতিনীতির উপর প্রভাব ফেলতে চান।

শাহির চিন্তিত হল। তার মনে হল, জনসাধারণের যথার্থ গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পক্ষে এটি একটা মস্ত বাধা।

কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে এ একটা দারুণ উদ্বেগের কারণ।

তাই কমিউনিস্ট পার্টির একটি গোপন নীতি হচ্ছে, সামরিক বাহিনীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করা।

সামরিক বাহিনীর ভেতরে সাম্যবাদী চিন্তাধারায় সম্পন্ন মানুষের অভাব নেই। কিন্তু সংখ্যায় তাঁরা নগণ্য। প্রতিক্রিয়ার প্রভাবাধীন মানুষের সংখ্যাই সেখানে সবচেয়ে বেশী।

অথচ একদিন এঁদের সঙ্গেই কমিউনিস্ট পার্টির শেষ মোকাবিলা করতে হবে।

তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

॥ বারো ॥

দেড় বছরের মেয়েকে বেতের দোলনায় তুলিয়ে গুন্ গুন্ স্বরে গান গেয়ে ঘুম পাড়াচ্ছিল লখমি।

দুষ্টু মেয়ে, ঠোঁটের ফাঁকে মিষ্টি কৌতুকের হাসি, চোখ বোজা, অথচ সে ঘুমোয় নি। আস্তে আস্তে মাথা দোলাচ্ছে গানের তালে তালে।

"মা আমার, সোনা আমার, রাজকন্যা আমার, লক্ষ্মীমণি, ঘুমোও ঘুমোও ঘুমোও!"

কিন্তু কে ঘুমোয়, চোখ বুজেই হাসছে দুষ্টু মেয়ে।

ঘুম করো।

রাগত স্বরে ধমক দিল লখমি।

চোখ খুলে বড় বড় চোখ নিয়ে মেয়ে তাকাল মায়ের দিকে। মুখে মজার হাসি।

আর পারছি না। সরেফন—

লখমি ডাকল বাচ্চা চাকরকে। জবাব নেই। আবার ডাকল, সরেফন—

যাই—

দূর থেকে শোনা গেল সরেফনের গলা। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন বেজে উঠল ক্রীং ক্রীং ক্রীং।

হ্যালো—

শোনা গেল সুলতানার গলা।—লখমি, তুই কী খুব ব্যস্ত?

না। কেন বল্ তো?

আমি তোর কাছে আসছি এক্ষুনি। বড্ড দরকার। বাড়ি আছিস তো?

হ্যাঁ। চলে আয়।

টেলিফোন ছেড়ে দিল লখমি। সুলতানার কণ্ঠস্বর খুব উদ্বিগ্ন শোনাচ্ছিল। কি ব্যাপার?

সাতদিন আগে সুলতানার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বোগোরের প্রাসাদে।

জাকার্তা-বান্দুং হাইওয়ের উপর চমৎকার রাজপ্রাসাদ বোগোর প্যালেস।

প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণের এটি একটি অন্যতম বাসভবন। আগে এক সামন্ত নৃপতির রাজপ্রাসাদ ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সম্পত্তি হয়েছে।

পুরনো ঐতিহ্যের সাড়ম্বর রীতিতে গড়া বিরাট প্রাসাদটি প্রেসিডেণ্ট আধুনিক সাজসজ্জায় সাজিয়েছেন।

তিন-চারটি ঘর বোঝাই হয়ে আছে প্রেসিডেণ্টের বিদেশ ভ্রমণকালে উপহার পাওয়া নানা রকমারী দ্রব্যাদি।

মিশর, যুগোশ্লাভিয়া, ভারত, চীন, আমেরিকা, জাপান, রাশিয়া, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, চেকোশ্লোভকিয়া, পাকিস্তান প্রভৃতি নানা দেশে সরকারীভাবে ভ্রমণ করেছেন প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ।

প্রতিটি ভ্রমণকালেই নানা রাষ্ট্র থেকে তিনি মহার্ঘ্য দ্রব্যাদি উপহার পেয়েছেন। প্রতিটি জিনিসই দেখবার মত বস্তু।

প্রেসিডেণ্ট এই রাজপ্রাসাদে তাঁর চতুর্থী পত্নী মাদাম্ হারতিনীর গর্ভজাত প্রথম পুত্রসন্তানের প্রথম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিরাট পার্টির আয়োজন করেছিলেন।

দুই জেনেরেলের স্ত্রী হিসেবে লখমি ও সুলতানা সেখানে নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হয়েছিল।

দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সস্ত্রীক এসেছিলেন। বিদেশী দূতাবাসের প্রধানরাও এসেছিলেন দামী উপহার নিয়ে।

জাপানী নৃত্য-শিল্পীদল আর ভারতের সরোদ বাদ্যশিল্পী প্রমোদবাসরের আকর্ষণের প্রধান বস্তু ছিলেন।

সুলতানার পাশেই বসেছিল লখমি।

চারদিকে আলো আর আনন্দের রোশনাই। সম্ভ্রান্ত পবিবেশ। প্রেসিডেন্টকে খুব হাসি খুশি দেখাচ্ছিল।

একজন পার্লামেণ্ট সদস্যের স্ত্রীও বসেছিলেন পাশে। তাঁকে গম্ভীর ও বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। হঠাৎ তিনি লখমির কানের কাছে মুখ এনে বলেছিলেন, এখানে এই স্বর্গপুরীতে মনেই হয় না ইন্দোনেশিয়ায় কোন দরিদ্র মানুষ আছে। অথচ দেশের শতকরা আশীজন লোকই আধমুঠা খেয়ে বেঁচে আছে।

জবাব দেয় নি লখমি।

সুবেশ পুরুষদের সঙ্গে সুসজ্জিতা নারীর দল মেপে মেপে কথা বলছিলেন, ওজন করে হাসছিলেন। অনেকেরই হাতে সোনালি সুরার গেলাস। আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট।

না, বোগোর-এর রাজপ্রাসাদের সেই ঝলমল হলঘরে কোথায়ও দুঃস্থ দীর্ণ মূর্খ অসহায় কোটি কোটি ইন্দোনেশিয়ান নরনারীর প্রতিচ্ছায়া ছিল না।

কিন্তু দেশ যত দরিদ্রই হক, কোন রাষ্ট্রপ্রধানের আবাসেই আড়ম্বরের অভাব দেখা যাবে না।

লখমি শুনেছে, একজন অদ্ভুত রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন সোভিয়েট রাশিয়ার নির্মাতা লেনিন।

সস্তা রুটি আর সাধারণ খাদ্য খেতেন। পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল নিতান্তই ছাপোষা শ্রমিক কৃষকের মত। বিলাসিতার ধার ধারতেন না। বিপ্লবের নেতৃত্ব করে একটি বিরাট দেশের চেহারা ও চরিত্র আমূল পরিবর্তিত করে দিয়েছিলেন।

ইন্দোনেশিয়ার একমাত্র স্লোগানও তো বিপ্লব।

অথচ বিপ্লবের প্রধান নেতা সুকর্ণের ব্যক্তিগত জীবনে বিলাসিতা ও সম্ভোগের প্লাবন

নারীদেহের প্রতি অদ্ভুত আসক্তি প্রেসিডেন্টের। কতবার বিয়ে আর বিবাহ-বিচ্ছেদ করেছেন।

ইসলামী শাস্ত্রীয় অনুমোদন মত চারটি বিবাহিত স্ত্রী আছে তাঁর।

অথচ দেশ-বিদেশে কত যে সহচরী ও প্রেয়সীর দল আছে তার সংখ্যা কারও জানা নেই।

পশ্চিম জার্মানীতে পরিভ্রমণ কালে একটি জার্মান তরুণী ছিল সঙ্গিনী। মেয়েটিকে নিয়ে তিনি সোজা চলে এসেছেন দেশে।

সেক্রেটারীর পদে মেয়েটি নাকি বহাল হয়েছে। লোকে ওকে নিয়ে হাসাহাসি করে। অথচ নির্লজ্জ মেয়েটা এই অনুষ্ঠানেও হাজির আছে।

রাজনীতিকের স্ত্রী মৃদুস্বরে বলছিলেন, মেয়েদের পেছনে এত টাকা খরচ করেন প্রেসিডেন্ট, অথচ কত লোক না খেয়ে মরছে। চালের দাম ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে।

লখমি চুপচাপ শুনছিল। সুলতানাও জবাব দেয় নি। ওই ভদ্রমহিলা রাজনীতিকের স্ত্রী। স্বাধীন মতামত প্রকাশ করায় তাঁর বাধা নেই।

কিন্তু লখমি ও সুলতানা দুজনেই দুই সরকারী চাকুরিয়ার স্ত্রী। স্বামীদের চাকরি আবার সামরিক বিভাগে।

বাড়ির সামনে একটা মোটর গাড়ি দাঁড়াবার শব্দ শোনা গেল। জানালা দিয়ে দেখল লখমি। ব্যস্ত পায়ে ভিতরে ঢুকছে সুলতানা।

সিঁড়ির নিচে অবধি নেমে সুলতানাকে অভ্যর্থনা করল লখমি। কোলের মেয়েকে দিল বাচ্চা চাকর সরেফনের হাতে।

ড্রইং রুমে নয়, একেবারে নিজের শোবার ঘরের নিভৃত অন্তঃপুরে বান্ধবীকে নিয়ে এল লখমি। জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার তোর?

ব্যাপার খুব গুরুতর। তুই কিছু শুনিস নি?

না তো।

তোর কর্তা কোথায়?

সুমাত্রার জোম্বি ডিস্ট্রিক্ট কোয়ার্টার্সে বদলি হয়েছিলেন মাস তিনেক আগে, জানিস তো। সেখানেই আছেন।

কেন রে?

আমার কর্তা আছেন তারই লাগোয়া পালেম-বাং-এ। অথচ শুনলাম, সুমাত্রায় বিরাট বিদ্রোহ ঘটেছে।

কারা বিদ্রোহ করেছে? কমিউনিস্ট?

না সামরিক ফৌজ। বিদ্রোহের নেতা কয়েকজন জেনারেল আর কর্ণেল।

আবার বিদ্রোহ?

হ্যাঁ। তাই তো শুনলাম।

লখমি কি ভাবল। জেনারেল জাহিরের শেষ চিঠি এসেছে প্রায় তিন সপ্তাহ আগে। নিছক কুশল জিজ্ঞাসার চিঠি। কোন খবর ছিল না।

সুলতানা বলল, আগে তো অনেকবারই বিদ্রোহ ঘটেছে। কিন্তু এত বড় আকারের বিদ্রোহ নাকি আর ঘটে নি। বিদ্রোহীদের হাতে চৌদ্দটি ব্যাটেলিয়ানের শক্তি।

লখমি আস্তে আস্তে বলল, গবর্নমেণ্ট কী চুপচাপ বসে আছে? বিদ্রোহ দমনের ব্যবস্থা করে নি?

না, চুপচাপ নেই। কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ জেনারেল নাসুশনের উপর বিদ্রোহ দমনের ভার দেওয়া হয়েছে। এয়ার মার্শাল সুকর্ণি সুরিদ্রমা বিমানবহর নিয়ে যাচ্ছেন। যুদ্ধ জাহাজগুলিও প্রস্তুত।

তাহলে তো গুরুতর কাণ্ড। আমি কিছুই শুনতে পাই নি।

হাসল সুলতানা। বলল, একেবারে যে রাধিকার দশা।

ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকাল লখমি। বলল, অর্থাৎ?

সুলতানা খ্যাতনামা কবি খাইরিল আনোয়ারের দুটি কবিতার

লাইন আবৃত্তি করল: "এখানে ওখানে স্মৃতি, স্মৃতির পাহাড়; বিস্মৃত হব যে তার সব অর্গল বন্ধ।"

লখমি হাসল। বলল, ন্যাকা! এই বিপদের সময়ও তোর ওসব কথা মনে পড়ে?

সুলতানা বসেছিল একেবারে লখমির খাটে। জুতো খুলে, হাত পা ছড়িয়ে। সে হাসল। বলল, চল একটু ঘুরে দেখি তোর বাড়িটা।

ড্রইং রুমে এসে দাঁড়াল দুজন।

দরজার ঠিক উপর ডঃ হুসেন সাহেবের বিরাট বাঁধান অয়েল পেন্টিং।

দেওয়ালের দুদিকে দুই ভাই-এর দুটো ছবি। বড় ভাই জেনারেল জাহির, ছোট ভাই কমরেড শাহির।

দুই ভাই-এর ছবির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল সুলতানা। লখমির মুখ গম্ভীর। সুলতানা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, তুই এখানে মরতে এসেছিস কেন?

জাহির বদলি হবার পর কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হয়েছিল। নতুন বাসা না নিয়ে এখানেই চলে এলাম। এ তো নিজের বাড়ি।

কমরেড আর বাড়ি আসে না?

না।

না আসুক। তবু এ বাড়িতে তো ওর অংশ আছে?

হ্যাঁ।

কোন্‌টা ওর অংশ।

পুরো নিচের তলা।

ওটা তো বন্ধ আছে দেখলাম। ওর কোন চাকর বাকর নেই?

না।

এটা তুই ঠিক করিস নি লখমি। শাহির তো যে-কোন সময় চলে আসতে পারে।

আসুক না।

তোর ভয় করে না?

ভয় কেন?

ন্যাকা! হাসল সুলতানা। বলল, ভয় না থাকুক, সংকোচও তো থাকতে পারে?

কিসের সংকোচ?

ব্যাঙের। কৌতুকের সঙ্গে কিছুটা বিরক্তির সুর শোনা গেল সুলতানার গলায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, এখানে চলে এসে তুই নিজের ক্ষতি করছিস।

আমি নিজে আসি নি। জাহির নিয়ে এসেছে।

আচ্ছা লখমি—

বান্ধবীর চোখের দিকে চোখ রাখল সুলতানা। গভীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি। বলল, তুই কী কাউকেই ভালবাসিস না?

ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসির রেখা ফুটল লখমির। বলল, এই যে তোকে ভালবাসি।

আমাকে ভালোবেসে তোর কি হবে? বলছি, কোন ব্যাটা ছেলেকে?

পুরুষ মানুষ? ওরা কী কেউ ভালবাসার যোগ্য আছে নাকি! সব অপদার্থ!

কেন জাহির সাহেব।

তিনি পতিদেবতা। আমি দাসী। প্রভু ও দাসীতে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠে না। সে সম্পর্ক দাসত্বের।

আর শাহির ভাই?

বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা কমরেড শাহির? দেশের জন্য সে তো আত্মোৎসর্গীত; ভালোবাসার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

বেচারা!

লখমি চুপ করে রইল। চা আর খাবার নিয়ে এল বুড়ী রোশনারা। বলল, আমাকে চিনতে পারো গো মেয়ে।

বাচ্চা বয়স থেকেই এ বাড়িতে মানুষ হয়েছে লখমি। স্কুল কলেজে পড়ার সময় লখমির সঙ্গে অনেকবারই সুলতানা এসেছে এবাড়িতে।

রোশনারা তখনও ছিল গৃহস্থালীর কর্ত্রী। এখনও তাই। কত অদল-বদল হয়েছে এ বাড়ির, সারা দেশের।

রোশনারার কোন পরিবর্তন নেই। শুধু আরো দুগাছি চুলে পাক ধরেছে, মুখের চামড়ায় আর দুটো ভাঁজ পড়েছে।

সুলতানা বলল, কেমন আছ গো মাসী?

ভাল কোথায়? জাহিরটা তবু মানুষ হল, ছোটটার কিছু হল না। এখনও বাউণ্ডুলে হয়ে আছে। একবার এসে দেখেও যায় না বুড়ীকে, মরল কি বাঁচল।

হুঁ। বড় খারাপ কথা।

ছেলেটা পার্টি, সভা, শোভাযাত্রা আর বক্তৃতা নিয়েই মরল।

মরবে কিগো? একদিন দেশের রাজা হবে।

রাজা আর হবে কি করে? আমরা না স্বাধীন হয়েছি? সে যাকগে, এবার চা খাও। একটু চেখে ছাখো তো। আর একটু পিঠে এনে দেব।

পিঠে মুখে দিয়ে উল্লাসে চিৎকার করে উঠল সুলতানা।—বাঃ ফার্স্ট ক্লাস। বিউটিফুল রান্না হয়েছে। তবে মাসী, আর পারব না। সকালে খেয়েই বেরিয়েছি।

আচ্ছা তুমি বসো। আর দুটো নিয়ে আসি।

খুশি মনে চলে গেল রোশনারা। রান্নার তারিফ করলে তার আনন্দের সীমা থাকে না।

চা খাবার খেয়ে আবার বৈষয়িক হয়ে উঠল সুলতানা। বলল, এদিকে খুব চা পিঠে খাচ্ছি, ওদিকে কর্তারা যদি সত্যি সত্যি বিদ্রোহ করে থাকেন, তাহলে কার যে গর্দান যাবে কে জানে!

সুলতানাই আবার বলল, প্রেসিডেন্ট নাকি অবিলম্বে বিদ্রোহ দমনের অর্ডার দিয়েছেন। পুরোপুরি যুদ্ধ চলবে।

স্বাধীনতা লাভের পর একটার পর একটা উত্তেজনা। ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রামও তো কম হল না। আর ভাল লাগে না।

আমাদের ভাগ্যটাই খারাপ। দেশের স্বাধীনতা এসেছে। সবাই এক হয়ে দেশকে বড় করার কাজে নামবে। না, নিজেদের মধ্যেই ঝগড়াঝাঁটি, বাদবিসম্বাদ, মারামারি।

সবারই চোখ একদিকে। সে হচ্ছে ক্ষমতা।

রো রো গর্জন করে আকাশে একটা বিমান উড়ে গেল। বাইরে না এসেও দুজনই কান পেতে শুনল দ্রুত ছুটে যাওয়া বিমানের শব্দ। এ বিমান গোলা ভরে হয়ত বিদ্রোহীদেরই মারতে যাচ্ছে।

সুলতানা বলল, এবার আমি উঠব ভাই। কিছু খবর পেলে জানাস। বড় ভয় করছে।

সুলতানা উঠে দাঁড়াল। ওকে কম্পাউণ্ডে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিল লখমি।

রুমাল উড়িয়ে, গাড়ি ড্রাইভ করে চলে গেল সুলতানা। রেখে গেল কিছু দুশ্চিন্তার ছায়া।

ড্রইং রুমে এসে বসল লখমি।

তাকিয়ে দেখল ডঃ হুসেন সাহেবের স্মিত হাসিমুখ ফটোগ্রাফের দিকে। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখল।

ডঃ হুসেন আর ডঃ সেনাপতির যুগ অস্তমিত।

চলছে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের যুগ।

স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। তবু দেশের মানুষের যথার্থ মুক্তি এল কই?

একের পর এক সংঘাত আর আলোড়ন দেশ গঠনের কাজকে ক্রমাগত পেছনে ফেলে যাচ্ছে। গ্রামে গ্রামে কোটি কোটি নিরন্ন

অশিক্ষিত মানুষ আগেকার মত তেমনি দারিদ্র্যের অক্টোপাসে নিষ্পেষিত।

ভাই-এ ভাই-এ মিল নেই। বরং ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রাম; বিদ্রোহ, হত্যার উল্লাস।

প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ যতই নবজাতক সন্তানের জন্মবার্ষিকী পালন করুন, বয়সে তিনি প্রবীণ। শরীরও ঠিক জুতসই নেই। তিনি বর্তমান, কিন্তু ভবিষ্যৎ তো একালের নেতারা।

একালের দুই প্রতীক জেনারেল জাহির ও কমরেড শাহির। ওরা কি কোনদিন মিলতে পারবে? দুইজনেরই আদর্শ দেশ, দেশের কল্যাণ, দেশের সমৃদ্ধি; অথচ দু'ভাই সাপে-নেউলের মত শত্রু।

জাহির কখনো ভাই-এর নাম মুখে আনে না। লখমি বেশ ভাল করে জানে, শাহিরের মনোভাবও ঠিক তাই। সেজন্য শাহির এ-বাড়িতেই আসে না।

হয়ত লখমির প্রতিও তার ঘৃণার অন্ত নেই। সে যখন শুনতে পেল জাহির লখমিকে বিয়ে করবে, তারপর থেকে সে এ বাড়ী-মুখো হয় নি। এক মুহূর্তের জন্যও আসে নি।

রোশনারার মুখে শুনেছে, শাহির তার বইপত্র, কাপড়চোপড়, আসবাব-পত্র কিছুই নিয়ে যায় নি। জাহিরই নিচের তলা খালি করে, সেখানে শাহিরের সব জিনিসপত্র ঢুকিয়ে ঘরগুলো তালা বন্ধ করে রেখেছে।

এক আত্মীয়ের হাত দিয়ে বাড়ি ভাগ করার খবর জানিয়ে ঘরের তালা পাঠিয়ে দিয়েছে শাহিরের কাছে।

সেই থেকে নিচের ঘরগুলো বন্ধ। দরজার তালায় মরচে ধরছে। কেউ আসে না।

শুধু রোজ একতলার বারান্দা সাফ করে বুড়ী রোশনারা। ছোট বয়স থেকেই শাহিরকে মানুষ করেছে বুড়ী। হাসিখুশি ছেলেটাকে

হয়ত অতিরিক্ত ভালোবেসেছিল। যেমন ভালোবেসেছিল মা-বাবা মরা অনাথ লখমিকে।

তার বিশ্বাস, শাহির একদিন আসবেই। হয়ত একেবারে বৌ নিয়েই আসবে। সেদিন সারা বাড়ি আলো করে আনন্দের হাট বসবে।

সেদিনের অপেক্ষায় আছে বুড়ী রোশনারা।

কিন্তু লখমি জানে, এ শুধু দিবাস্বপ্ন ; সুখের স্বপ্ন। বাস্তবে তা কোনদিন ঘটবে না।

শাহিরকে খুব ভাল করে জানে লখমি। ওই হাসিখুশি মুখের নিচে অনেক দৃঢ়তার শক্ত মাটি। লোকটার আনন্দ যত প্রবল, অভিমানও তেমনি প্রচণ্ড। এবং ঘৃণাও ঠিক তেমনি ভয়াবহ।

সরেফন—

ডাকল লখমি।

আজ্ঞে। সরেফনের মৃদু পায়ের শব্দ শোনা গেল বারান্দায়। কাছে এসে বলল, খুকি ঘুমিয়ে পড়েছে।

বেশ। তুই খেতে যা।

ড্রইংরুমের লাগোয়া একটি ছোট লাইব্রেরী ঘরে এসে বসল লখমি। চারদিকে বইপত্রের আলমারী। বাচ্চা বয়স থেকে বইগুলি দেখে আসছে সে। অনেকগুলিই পড়া।

এখানে বসে ছেলেবেলার অনেক কথা মনে পড়ে লখমির।

ডঃ হুসেন। মিসেস হুসেন। ছোট জাহিরের গম্ভীর রাশভারী মুখ। কৌতুকে ঝলমল বাচ্চা শাহির। বুড়ী রোশনারা। সুলেমান।

পেছনে ফেলে আসা স্মৃতির কুম্ভ যেন সত্যি এখানে ঢাকনা খুলে অনন্ত কথা বলে চলে।

একদিন স্কুল ছুটি, শাহির আর লখমি দুজনে রোশনারার ভাঁড়ার চুরি করে চাটনির বোতল নিয়ে এসে সিঁড়ির তলায় গোপন আস্তানায় বসে রসিয়ে রসিয়ে চাটনি খাচ্ছিল।

কে রে ?

হঠাৎ কে প্রশ্ন করেছিল। দুজনে তাড়াতাড়ি আবর্জনার মধ্যে চাটনির বোতল লুকিয়ে রেখে বলেছিল, আমরা।

আমরা কে ?

এগিয়ে এসেছিল রোশনারা। দুজনের হাত খপ করে ধরে জিজ্ঞেস করেছিল, তোরা এখানে কি খাচ্ছিলি রে লুকিয়ে লুকিয়ে ?

কই না তো।

অ্যাঃ আবার মিথ্যে কথা ?

শাহির বীরের মত বুকে হাত দিয়ে বলেছিল, দ্যাখো মুখে গন্ধ আছে কিনা। কিছু খেলে তো গন্ধই পাবে।

গন্ধ ? সারা মুখে চাটনি লেগে আছে, আবার গন্ধ শুঁকতে হবে। বলো কে চুরি করেছে, নইলে সাহেব আসুন, কার ভাগ্যে কত মার আছে বুঝতেই পারবে।

আমি না মাসী। ও-ও-ওই করেছে।

ভয়ে কেঁদে উঠেছিল লখমি।

হ্যাঁ ওই করেছে। মুখ ভেংচে উঠেছিল শাহির। তারপর গালে কসে একটা চড় মেরেছিল।

যেন বয়স অনেক কমে গেছে। এই এক্ষুনি ঘটল ঘটনাটা। গালে হাত বুলোলু লখমি। আঃ কি সুখের দিন ছিল সেদিন।

ভয় ভাবনা ছিল না, চিন্তা যন্ত্রণা উদ্বেগ ছিল না। শিশুর অনাবিল আনন্দের জগৎ।

আস্তে আস্তে সারা শরীরে ভরে এল যৌবনের ছাপ। মনের আকাশ অনেক বেড়ে গেল। অনুভূতির গভীরতা এল, এল উন্মত্ত আবেগের ঝড়।

এল • আর এক খুশি আর পরিপূর্ণতার পৃথিবী। যৌবনের পৃথিবী। বিচিত্র অদ্ভুত মাদকতাময় পৃথিবী।

পরিপূর্ণ পুরুষ আর পরিপূর্ণ রমণী।

লখমি—

রান্নাঘর থেকে রোশনারার গলা শোনা গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লখমি। সাড়া দিল, যাই।

চান করতে যা মা। অনেক বেলা হল আর দেরি করিস না।

না দেরি করব না।

নিজের ঘরে চলে এল লখমি। ছোট্ট বিছানায় অকাতরে ঘুমোচ্ছে দেড় বছরের মেয়ে মুন্নি। হিসু-করা ভেজা তোয়ালের উপরই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে।

ভেজা তোয়ালে বদল করে ঘুমন্ত মেয়ের মুখে চুমো খেয়ে আদর করল লখমি। তারপর ড্রেসিং টেবিলের কাছে এসে মাথার তেল হাতে নিয়ে চুলে রগড়াতে লাগল।

চোখ পড়ল টেবিলের উপরে দেয়ালে লাগান একটা বিরাট ছবির দিকে। বিয়ের সময় ছবি তুলেছিল জাহিরের এক বন্ধু। সেটিরই বিরাট এনলার্জমেণ্ট বাঁধাই করে টাঙিয়ে রেখেছে জাহির।

জাহির, জেনারেল জাহির। লখমির স্বামী, সন্তানের জনক।

অথচ কত অপরিচিত মনে হয় ওই মানুষটিকে। বাল্যকাল থেকেই লোকটি গম্ভীর প্রকৃতির। বেশী কথা বা উচ্ছ্বাস একেবারে পছন্দ করত না।

তার মা ও বাবাও ভয় করতেন বড় ছেলেকে। লখমিও কখনো ভাল করে তাকিয়ে দেখে নি জাহিরকে।

আজও দেখে না।

বিয়ের পর একই বিছানায় নিদ্রা গেছে দুজনে। যৌবনের উত্তাপে আতপ্ত কোন কোন মুহূর্তে জাহির স্ত্রীর রমণীদেহ থেকে মধু সঞ্চার করে আকণ্ঠ পান করেছে।

লখমি বাধা দেয় নি, নিঃশেষে দিয়েছে। কিন্তু সে জানে, সে শুধু আত্মসমর্পণ। সামাজিক কর্তব্য পালন।

তার বেশী নয়। হয়ত জাহিরও তা জানে। জানে বলেই তৃপ্তি পেয়েই খুশি।

মন নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

চানের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে জলের ঝরণা খুলে দিল লখমি। মুখে চোখে জলের ধারা, সারা অঙ্গে জলের স্নিগ্ধ আলিঙ্গন।

হঠাৎ দূরে যেন কামানের গর্জন শুনতে পেল লখমি। না, কামান নয়, বাইরে গেটের দরজায় একসঙ্গে অনেকগুলি করাঘাত।

তাড়াতাড়ি চান শেষ করে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল লখমি।

দ্রুত নেমে গেল গেটে।

কি ব্যাপার ?

রোশনারা, সরিফন, সুলেমান সবাই আছে। গেটে পুলিস।

লখমিকে দেখে ইউরোপীয় স্যুট পরা একজন সম্ভ্রান্ত চেহারার ভদ্রলোক কাছে এগিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আশা করি আপনিই মিসেস জাহির হুসেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনার স্বামী কি এখানে আছেন ?

না।

তিনি কোথায় ?

তিনি তো তাঁর কর্মস্থানে আছেন। তিনি জোম্বি মিলিটারী কোয়ার্টার্সের ইনচার্জ। পদমর্যাদায় জেনারেল।

আপনি শুনে দুঃখিত হবেন, জেনারেল জাহির সামরিক কাজ থেকে পদচ্যুত হয়েছেন। তিনি বিদ্রোহী।

আমি কিছু জানি না।

না জানবারই কথা। ওরা গোপনেই কাজকর্ম করেন।

জবাব দিল না লখমি।

বুড়ী রোশনারা হাউমাউ করে কেঁদে কপাল চাপড়াতে লাগল। তার চিৎকার শোনা গেল, বড় ছেলেটাও মন্দ হয়ে গেল। এবার তাহলে কি হবে গো!

এই চুপ করো!

ধমকে উঠলেন ভদ্রলোক। লখমির দিকে তাকিয়ে বললেন, জাহির সাহেব যদি আসেন তাহলে তৎক্ষণাৎ খবর দেবেন। অবশ্য কাজটা স্ত্রীর পক্ষে খুব কঠিন। কিন্তু বুঝতেই পারছেন অপরাধ গুরুতর। রাষ্ট্রদ্রোহিতার মত মারাত্মক অপরাধ হয় না। আর আত্মরক্ষা তো সবারই করতে হবে। তা স্ত্রীই হোন, আর স্বামীই হোন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লখমির দিকে তাকালেন ভদ্রলোক। যেন অন্তরের ভেতরটা পর্যন্ত দেখে নিতে চান।

আচ্ছা, আমরা যাচ্ছি, আপনি বুদ্ধিমতী, বিদুষী বলে শুনেছি। আশা করি আপনাকে এর বেশী বুঝিয়ে বলার দরকার হবে না।

ভদ্রলোক ফিরে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিস ফৌজও চলতে শুরু করল। রাস্তায় দুটো ট্রাক অপেক্ষা করছিল। ওরা উঠতেই ট্রাক দুটো ছেড়ে দিল।

রোশনারা তখনও মাথায় করাঘাত করে চলেছে। সরেফন আর সুলেমান স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে।

লখমি আস্তে আস্তে বলল, মা, চুপ করো!

বিষণ্ণ শোকের চোখ নিয়ে তাকাল রোশনারা।

লখমি বলল, অত সহজে ভেঙে পড়তে নেই। আর তুমি তো অনেক কিছু দেখেছ মা। কাঁদতে নেই।

পাশের ঘরে হঠাৎ কেঁদে উঠল খুকি। সে ঘরের দিকে আস্তে আস্তে পা বাড়াল লখমি। ঘড়িতে তখন দুপুর বারোটা।

॥ তেরো ॥

সামরিক বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ, অভ্যুত্থানের পর অভ্যুত্থান, মনে হয় যেন এর আর অন্ত নেই; একটা জাতির সহনশক্তির উপর নিশ্চয়ই প্রবল চাপ সৃষ্টি করে রেখেছে।

ইতিহাসে এ এক ট্র্যাজিক অধ্যায়।

কিন্তু সুমাত্রায় চৌদ্দটি ব্যাটেলিয়ান নিয়ে জেনারেলদের এই বিরাট বিদ্রোহের বুঝি তুলনা নেই।

পুরো কেন্দ্রীয় সামরিক বহর নিয়ে জেনারেল নাসুশন যখন বিদ্রোহীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, ওরা দস্তুরমত তৈরি।

বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ নয়। গর্জে উঠল কামান, মুহুর্মুহু গুলি বর্ষিত হতে লাগল রাইফেল থেকে। বোমারু বিমানগুলি বিদ্রোহিদের ঘাঁটির উপর নির্মমভাবে বোমাবর্ষণ করতে লাগল।

জাভার বন্দর থেকে ছুটে গেল নৌবহর। বোমার গর্জন আর আহতদের আর্তনাদ; রণক্ষেত্র ভয়াবহ আকার ধারণ করল।

কেন্দ্রীয় সামরিক দপ্তর থেকে সুমাত্রার কাছাকাছি সামরিক ঘাঁটিগুলিব কাছে জরুরী তলব গেল, জেনারেল নাসুশনের অধীনে বিদ্রোহ দমনের সামরিক তৎপরতায় যোগ দাও।

বোর্নিও, তিমর, ফ্লোরেস, সুম্বায়া, মলিওক্কাস প্রভৃতি দ্বীপগুলির সামরিক কর্তারা কেন্দ্রীয় শাসকদের প্রতি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ না করলেও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে রাজী হল না।

তাঁদের অজুহাত, তাঁদের বাড়তি সৈন্যবাহিনী বা অস্ত্রশস্ত্র ও রসদের অভাব।

যেটুকু আছে তা সুমাত্রায় পাঠিয়ে দিলে স্থানীয় শাসন বানচাল হয়ে পড়বে।

বিদ্রোহীদের এজেন্ট ছিল সিঙ্গাপুরে। সেখান থেকে পেট্রল আনাবার ব্যবস্থা হল। ছয়টি মালবাহী বিমানও কেনা হল যা সহজেই বোমারু বিমানে রূপান্তরিত করা সম্ভব হবে।

পেডাঙে মেসিনগান পোস্টগুলি বালিভর্তি থলে ঢেকে সংরক্ষিত করা হল। সেগুলির পাহারা দিতে লাগল নতুন গড়ে তোলা গেরিলা ফৌজ।

কর্নেল সুমুয়াল সরকারী ফৌজের হাত থেকে সেলেবেস শহর পুনরাধিকার করলেন। সেখানে তিনি গেরিলা বাহিনীতে ত্রিশ হাজার নতুন সৈন্য রিক্রুট করলেন।

বিদ্রোহী সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সোল্লাসে যোগ দিল সুমাত্রার নওজোয়ানেরা।

তাদের বহুকালের বিক্ষোভ জাভাবাসীদের উপর। শত শত দ্বীপ নিয়ে গঠিত দ্বীপমালার দেশ ইন্দোনেশিয়ায় বৃহত্তম দ্বীপ সুমাত্রা।

এই দ্বীপের পেট্রল, খনিজ ও কৃষি সম্পদ দেশের বৃহত্তম অর্থার্জনের মাধ্যম। সুমাত্রার উৎপাদিত সামগ্রী রপ্তানী করেই দেশের সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা আমদানী হয়।

অথচ মাঝারি দ্বীপ জাভায় ইন্দোনেশিয়ার প্রায় ষাট পারসেণ্ট জনসাধারণ বাস করে। সে অনুপাতে দেশের অধিকাংশ আয় জাভার সমৃদ্ধির জন্যই ব্যয়িত হয়ে থাকে।

জনসংখ্যার আধিক্যের ফলে জাভাই সারা ইন্দোনেশিয়ার শাসনযন্ত্রের চালক ও ধারক। জাভা জনসাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছাই ইন্দোনেশিয়ার ভাগ্য নিয়ন্ত্রক।

সুমাত্রায় দীর্ঘকাল ধরেই অসন্তোষ ছিল।

এখানকার মানুষদের ইচ্ছা, সারা দেশে ফেডারেল শাসনতন্ত্র

প্রতিষ্ঠিত হউক। বিভিন্ন অঞ্চল পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করবে। কেন্দ্রের উপর ন্যস্ত থাকবে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয়ক সম্পর্ক এবং মুদ্রা।

অন্যান্য বিষয়ে অঞ্চলগুলি স্বাধীনভাবে নিজেদের সমৃদ্ধি রচনা করবে।

কিন্তু তা হয় নি।

সুমাত্রার পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ক্রমশ ঘৃণায় পরিণত হচ্ছিল। সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহ তাই তাদের সক্রিয় সহযোগিতায় পুষ্ট হতে লাগল।

এদিকে জেনারেল নাসুশনের বিমানবহর সুমাত্রার উপর ক্রমাগত বোমাবর্ষণ করতে লাগল। নিরীহ জনসাধারণ প্রতিদিনই নিহত হতে লাগল।

সুমাত্রার একজন বরেণ্য সন্তান ডঃ বাদের জোহান। তিনি জাকার্তায় ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট।

সুমাত্রায় বর্বর বোমাবর্ষণের প্রতিবাদে তিনি পদত্যাগ করলেন। শাসনবিভাগের উচ্চপদে যে কয়জন সুমাত্রার অধিবাসী অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁরাও পদত্যাগের হুমকি দিলেন।

জাভায় বসবাসকারী প্রতিটি সুমাত্রানের ওপর পুলিস তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে লাগল; বিদ্রোহী রেডিও'র বার্তা শুনবার অভিযোগে অনেককেই বন্দী করে রাখা হল।

সারা দেশে এক অস্থির উত্তেজনা।

বিদ্রোহীদের প্রধানমন্ত্রী জাফরুদ্দীন বেতার বক্তৃতায় বলতে লাগলেন: বাং কর্ণ আসলে একজন কাপুরুষ। বডিগার্ড না নিয়ে বাথরুমে একা যেতেও তাঁর সাহস নেই। কখনো যুদ্ধ না করেই তিনি যুদ্ধজয়ের মেডেল পোশাকে ঝুলিয়ে রাখতে তাঁর লজ্জা নেই।

ডঃ মহম্মদ হাতার উপর বিদ্রোহীদের আস্থা ছিল। কিন্তু তিনি

বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস নিয়ে বক্তৃতা দিতেই ব্যস্ত থাকলেন।

বক্তৃতায় বলা হল: রোগী যখন মরছে, তিনি তখন নিঃশব্দে অপেক্ষা করে আছেন। মারা যাওয়ার পর মর্গে তিনি পোস্ট-মর্টেম করবেন। বেঁচে থাকার সময় কি তাঁর কিছুই করণীয় নেই?

কিন্তু মহম্মদ হাত্তা কোন বাক্য উচ্চারণ করলেন না।

কয়দিন প্রচণ্ড যুদ্ধ হল সুমাত্রার বুকে। ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রামে রক্তাক্ত হল সারা দ্বীপের মাটি।

বিদ্রোহীদের অধীনে স্থলবাহিনী থাকলেও বোমারু বিমান বা যুদ্ধ জাহাজ ছিল না। তাই আকাশ থেকে সাংঘাতিক বোমাবর্ষণের প্রত্যুত্তর দিতে পারল না বিদ্রোহী।

নৌবাহিনীও বিদ্রোহী বন্দরগুলি অবরোধ করে রাখল।

শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ করতেই হল। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এই বেপরোয়া বিদ্রোহের দারুণ প্রতিশোধ নিলেন। সেনাপতিদের পদচ্যুত করা হল, সাধারণ সৈনিকদেরও প্রায় বন্দী দশা।

বিদ্রোহীদের অনেকেই দেশ ছেড়ে পালালেন।

পালাল জেনারেল জাহিরও।

ইন্দোনেশিয়ার সীমানা ছেড়ে জেনারেল জাহির গেল সিঙ্গাপুর। ইংরেজদের প্রাক্তন সামরিক বন্দর। চীনা অধিবাসীদের সংখ্যা প্রায় মালয়ীদের সমান সমান। অ্যাংলো-চাইনীজের সংখ্যাও অনেক।

জেনারেল জাহির রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করল না। গোপন আস্তানায় লুকিয়ে থাকল। সুযোগ সুবিধা মত ইন্দোনেশিয়ায় আবার আবির্ভূত হবে এই তার আকাঙ্ক্ষা।

ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রেখে চোখে পরল রিমলেস চশমা। চেহারাটা অন্যরকম দেখতে হল। এক পুরাতন সতীর্থের সুপারিশে নাম

ভাঁড়িয়ে এক অ্যাংলো-চাইনীজ রেস্টুরেন্ট-কাম-বারের ক্যাশিয়ারের চাকরি নিল।

বিল আর নগদ টাকা আর হিসাবপত্র জাহিরের বাইরের জীবনে জড়িয়ে রইল। কিন্তু অন্তর্জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—ইন্দোনেশিয়ায় আবার বিদ্রোহ।

যে বিদ্রোহ দমন করা কিছুতেই সম্ভব হবে না প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের। তাঁর ডিক্টেটরী শাসনের সৌধ ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে গঠনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ফেডারেল কাঠামো।

ক্যাশিয়ারের ঘেরা-চেয়ার থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর রাখে জাহির। স্ফূর্তিবাজ নরনারীর ভিড়, উদ্দাম নৃত্যের উতরোল, গেলাসের পর গেলাস সোনালী সুরা। ধনী মালয়ী, ব্যবসায়ী চীনা, ইংরেজ আমেরিকান নাবিক বা শিল্পপতি আর ঠোঁটে মুখে রং চং মাখা ঝলমল পোশাকের অ্যাংলো-চাইনীজ তরুণীর দল।

স্ফূর্তিবাজদের মাঝখানে কখনো হয়ত আসে গম্ভীর চেহারার কোন মানুষ। মনে হয় যেন উত্তাল তরঙ্গের মাঝখানে একটি স্থির দ্বীপ। ক্যাশিয়ার জাহির এমন মানুষের দিকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে।

আর তাকায় রেস্টুরেন্টের বেয়ারা সিরাজের দিকে।

সিরাজ ক্যাশিয়ার জাহিরের দক্ষিণ হাত, সংবাদ আদান-প্রদানের বিশ্বাসী দূত।

ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার নাসেরকে কেউ খুঁজে পায় নি। সেই নাসের এখানে বেয়ারা সিরাজ।

॥ চৌদ্দ ॥

সামরিক বিদ্রোহ দমন করার পর জেনারেল নাসুশন পুনর্বার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলেন।

অনেক বছর আগে মাসজুমি পার্টির নেতৃত্বে যখন জাকার্তার রাস্তায় রাস্তায় তুমুল ছাত্র ও জনবিক্ষেভ ফেটে পড়েছিল, জেনারেল নাসুশন তখন বিক্ষোভ দমনের অক্ষমতার জন্য কর্মচ্যুত হয়েছিলেন।

পরে চীফ অব স্টাফ পদে পুনর্বহাল হলেও আগেকার প্রতিপত্তি ফিরে পান নি। অনেকদিন তাঁকে কালোমুখ নিয়ে থাকতে হয়েছিল। এবার তাঁর প্রতিচ্ছবি জনসাধারণের মনে এক তীব্র আলোকচ্ছটা সৃষ্টি করল।

প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণের ব্যক্তিত্বও উজ্জ্বল হয়ে উঠল জাতীয় বিজয়-বৈজয়ন্তীতে। পশ্চিম ইরিয়ান নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় জাগরণের কাছে বিদেশী সরকারকে নতি স্বীকার করতে হল।

শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, পশ্চিম ইরিয়ানকে ইন্দোনেশিয়ার শাসন কর্তৃত্বাধীনে রাখা হবে। বছর বার এই শাসনের পর সেখানে গণভোট নেবার ব্যবস্থা হবে। সেই ভোটের ফল থেকে স্থির হবে পশ্চিম ইরিয়ান পুরোপুরি স্বাধীন হবে, নাকি ইন্দোনেশিয়ার অঙ্গীভূত হয়ে থাকবে।

সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার বিজয়-উৎসবের বন্যা বয়ে চলল। আলো আর উৎসব আর জনতার উল্লাস। জাতির এই বিজয় লাভের জন্য স্টেডিয়ামে এক বিশাল জনসমাবেশের সামনে প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ জনগণকে অভিনন্দন জানালেন।

সেই আনন্দ উৎসব উপলক্ষে জেল থেকে অনেক বন্দীকে মুক্তি

দেওয়া হল। ঘোষণা করা হল, যে সব সামরিক বাহিনীর নেতা বিদ্রোহ করেছিলেন তাঁরা যদি নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন তাঁদের মার্জনা করা হবে।

জাতির উৎসবের দিনে কারও ক্ষোভ রাখা হবে না। সমগ্র জাতি এক হয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হবে।

*   *   *

সিঙ্গাপুরের 'দি ইস্টার্ণ স্টার' অ্যাংলো-চাইনীজ রেস্টুরেন্টে একটি উত্তাল রজনী শুরু হল বিকেলের আলো ম্লান হতে না হতেই।

সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রি, রাত্রির প্রথম লগ্ন ছাড়িয়ে মধ্য রজনী, স্ফূর্তির উন্মত্ত প্রবাহ চলবে ঘড়ির কাঁটার দিকে লক্ষ্য না রেখে।

আজকের নায়ক লাওসের এক প্রবীণ শিল্পপতি। ইয়ার বন্ধু-বান্ধব আর কয়েকটি ইয়োরেশিয়ান যুবতী নিয়ে মস্ত টেবিল জাঁকিয়ে প্রমোদ বাসর বসেছে।

বেয়ারা সিরাজ ঘন ঘন সেলাম দিয়ে সুরা পরিবেশন করছে। অন্য দিকে নজর দেবার মত তার মেজাজ নেই।

পেগের পর পেগ উড়ে যাচ্ছে, কুণ্ডলী পাকিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া উড়ছে। তুমুল জমে উঠেছে আড্ডা।

ঘড়ির কাঁটা কখন যে একটার ঘর ছাড়িয়ে চলে গেছে, সেদিকে খেয়াল নেই।

অন্যান্য লোকজন প্রায় সবাই চলে গেছে। বেয়ারাও উসখুস করছে। রেস্টুরেন্ট বন্ধ করার সময় হল।

একগাদা বিল নিয়ে সেলাম করে দাঁড়াল বেয়ারা সিরাজ।

অ্যাঁ, এবার উঠতে হবে?

আপনার মর্জি হুজুর।

নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালেন শিল্পপতি। তারপর তাকালেন বিরাট দেয়াল ঘড়িটার দিকে।

জিজ্ঞেস করলেন, কত হয়েছে?

বিলগুলো একসঙ্গে পিন দিয়ে আটকে অঙ্কগুলো জুড়ে যোগফল দেওয়া ছিল।

বুকপকেট থেকে একগুচ্ছ নোট বার করে রুপোলি ট্রেতে ছুঁড়ে মারলেন। বললেন, কী যেন তোমার নাম ?

মহম্মদ সিরাজ।

নিবাস ?

কাছাকাছি একটা বাড়িতে ভাড়া থাকি হুজুর।

বেশ। আমাকে পৌঁছে দিতে পারবে ?

হুকুম করলেই হবে হুজুর। সব পারব।

ক্যাশিয়ার জাহির বিল গুণে খুচরো টাকা দিল বেয়ারা সিরাজের হাতে। ততক্ষণে শিল্পপতি উঠে পড়েছেন, ইয়ার বন্ধুরা অনেকেই কেটে পড়েছিল, যুবতীগুলিও চলে গেছে।

সিরাজ ?

জী হুজুর।

তুমি একটা ট্যাক্সি জোগাড় কর।

অন্যান্য বেয়ারারা জানালা বন্ধ করছে, টেবিল পরিষ্কার করছে। একটি কর্মব্যস্ত রজনীর অবসান।

ক্যাশিয়ার জাহিরও ক্যাশ মিলিয়ে কীপারের হাতে চাবি রেখে একটা হাই তুলে নিচে এসে দাঁড়াল।

হ্যালো ক্যাশিয়ার ?

জাহির জবাব দিল, ইয়েস স্যার।

চলো তোমার বাড়ি যাব।

ততক্ষণে ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হয়েছে সিরাজ। শিল্পপতি উঠলেন গাড়িতে। সঙ্গে গিয়ে বসল জাহির। ড্রাইভারের পাশে জায়গা করে নিল সিরাজ।

আধঘণ্টার মধ্যেই গাড়ি এসে পৌঁছে গেল শহরের উপকণ্ঠে একটা তিন তলা ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে।

ভাড়া মিটিয়ে তিনজনে সিঁড়ি বেয়ে তিন তলার দু-কামরার ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়াল।

জাহির তালা খুলে বারান্দার সুইচ জ্বালিয়ে দিল। সিরাজ সন্তর্পণে গেট বন্ধ করে এগিয়ে গিয়ে ঘরের বাতি জ্বালাল।

শিল্পপতি বললেন, আজ আনন্দের দিনে তোমরা দুজন মুখ গুমড়ো করে বসে আছ কেন?

আনন্দ? তা বটে।

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন শিল্পপতি। বললেন, আমি কিন্তু খুব আনন্দ করলাম।

সিরাজ মুখ খুলল, আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। একের পর এক গেলাস টেনে যাচ্ছিলেন, যদি বেফাঁস কিছু বলে ফেলতেন?

আরে দূর। শরিফুদ্দীন সে পাত্রই নয়।

একটু থেমে বললেন, শোন ডাচরা বলতো ওয়েস্ট নিউ গিনি, আমরা বলি পশ্চিম ইরিয়ান। বিজয়োৎসবের পর এখন নামকরণ হয়েছে ইরিয়ান ভারত। ইরিয়ান ভারত থেকে ডাচদের হটে যেতে আমরা বাধ্য করেছি।

এ জয় তো প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের জয়।

না, শুধু প্রেসিডেন্টের হবে কেন? সমগ্র ইন্দোনেশিয়ান জাতির জয়। শুধু শুধু অভিমান নিয়ে থেকো না। আর—

বলুন?

এখানকার স্বেচ্ছা-নির্বাসন এবার তুলে নাও।

জাকার্তা?

হ্যাঁ।

সিরাজ আর জাহির চোখাচোখি করল। জাহির বলল, আপনি?

আমার এখনো সময় হয় নি। তবে জেন, ঠিক সময় মত আমি ঠিক জায়গায় হাজির থাকব।

কোটের পকেট থেকে দুটো টিকেট বার করে জাহিরের হাতে দিলেন শিল্পপতি। বললেন, একটা ছোট জাহাজ যাচ্ছে পন্টিয়ানাকে। তোমরা দুজনে এই বেশেই সেখানে উঠে পড়বে। একটা ছোট কেবিন তোমাদের জন্য রিসার্ভ করা আছে। পন্টিয়ানাক থেকে যাবে মাকাসার। সেখানকার হোটেল রিপাবলিকে তোমাদের থাকার ব্যবস্থা আছে। সেখানেই তোমরা পরবর্তী খবর পাবে।

প্রেসিডেণ্ট নাকি বিদ্রোহীদের মার্জনা করেছেন?

হ্যাঁ। তোমাদের বিরুদ্ধে কেস উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। স্বপদেই বহাল হবে।

কিন্তু—

না। কোন কিন্তু নয়। বাং কর্ণ যতই লাফালাফি করুন, তাঁর বয়স হয়েছে অনেক। শরীরও খারাপ। কিডনীর অবস্থা একেবারেই কাহিল।

জাহির বলল, শুনেছি।

কাজেই বাং কর্ণোর পরে দেশের কি হবে? কমিউনিস্টরা শাসনক্ষমতায় বসুক এই চাও?

তাহলে দেশ উচ্ছন্নে যাবে।

শোনো, এ একটা মস্ত সুযোগ। শুধু দেশে ফেরা নয়, সামরিক বিভাগে স্বপদে যোগ দিতে পারছ। পুরো সৈন্যবাহিনীকে সংঘবদ্ধ করতে হবে।

কিন্তু অনেক কমিউনিস্টও যে আমাদের সৈন্যবাহিনীতেই ঢুকে পড়েছে। কয়েকটা জেনারেল ব্রিগেডিয়ারও ওদের চর।

তাহলেই বিপদটা বুঝতে পারছ। প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ কমিউনিস্টদের তা দিয়ে দিয়ে ভয়ঙ্কর কাণ্ড করে বসে আছেন। শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে ওদের প্রতিপত্তি তো দেখতেই পাচ্ছ। অন্য সব পার্টিগুলো কোন কাজেরই নয়।

কয়েকটাকে তো বেআইনী করে রাখা হয়েছে।

হ্যাঁ। কমিউনিস্টদের যদি রুখতে হয় তাহলে সৈন্যদলের মধ্যে একতা ও শক্তি সঞ্চার করতে হবে। তোমরা দেশে ফিরে যাও।

জাহাজ কবে ছাড়ছে?

ও, সেটাই বুঝি বলি নি। আগামীকাল দুপুর বারোটায়। তোমরা ঠিক আধঘণ্টা আগে সেখানে পৌঁছবে।

আচ্ছা।

সিরাজ একটা বোতল বার কর। সত্যি আজ আনন্দের দিন। জাতির পক্ষেও বটে, আমাদের ব্যক্তিগত ভাবেও বটে।

লাল রঙের একটা বোতলের ছিপি খুলে তিনটে গ্লাস ভর্তি করল সিরাজ।

গ্লাসে গ্লাসে ঠোকাঠুকি করে তিনজনই বলল, জয় ইন্দোনেশিয়ার জয়।

জাহির বলল, কমিউনিস্ট পার্টি জাহান্নমে যাক।

সিরাজ বলল, সামরিক বাহিনীর জয় হক।

পুরো গ্লাসের সবটুকু মদ মুখে পুরে দিয়ে শিল্পপতি বললেন, এসো তিনজনে টুইস্ট নাচ নাচি। আজ বড় খুশির দিন।

জাহির বলল, আমরা দেশে ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু সেখানে আমাদের বিদ্রোহী প্রধান মন্ত্রী শরিফুদ্দিন সাহেবের জন্য অপেক্ষা করব স্যার।

শিল্পপতি হাসলেন। জবাব দিলেন না।

॥ পনেরো ॥

১৯৩১ সালের মে মাসে প্রেসিডেন্টের এক গুরুত্বপূর্ণ আদেশে সারা দেশ থেকে জরুরী নিরাপত্তামূলক অবস্থা তুলে নেওয়া হল।

দৈনন্দিন শাসনকার্যের প্রধান অঙ্গ ছিল সামরিক বাহিনী। ডাচ সম্পত্তির অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসাবেও তাঁদের কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু জরুরী অবস্থা তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক বাহিনীকে মিলিটারী ব্যারাকে ফিরে যেতে হল।

এই ব্যবস্থাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে বিরাট বিরাট জনসভা হল সারা দেশে।

জাকার্তার কেন্দ্রীয় জনসভায় সভাপতিত্ব করলেন কমিউনিস্ট পার্টির অবিসম্বাদিত নেতা অদিতি।

তিনি বললেন, প্রেসিডেন্টের এই আদেশের ফলে গণতান্ত্রিক শক্তি বলবান হবে। আমরা বিপ্লবের ধুয়া তুললেও দেশে যথার্থ বিপ্লব এখনো শুরু হয় নি। ডাচদের বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে আমরা সংগ্রাম করেছিলাম। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে আমরা যে বিপ্লব শুরু করেছিলাম তা আন্তর্জাতিক বিপ্লবের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, পেতিবুর্জোয়া, জমিদার সকলেই যে সংগ্রামের অংশীদার ছিলেন, বাস্তব অবস্থা হচ্ছে বিপ্লব শুরু হবার সময় ইন্দোনেশিয়া ছিল ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ ; তাই এই বিপ্লবের চরিত্র ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চরিত্র। আমাদের সামনে দ্বিমুখী কর্তব্য ছিল। এক : সমগ্র জাতিকে মুক্ত করার জন্য ইন্দোনেশিয়া থেকে ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়িত করা এবং দুই : গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধন

করা অর্থাৎ দেশী ও বিদেশী জমিদার ও ধনিকদের পীড়ন থেকে নিষ্পেষিত জনসাধারণকে মুক্ত করা।

আমরা প্রথম কর্তব্য সমাপ্ত করেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত দ্বিতীয় কর্তব্য সফল হয় নি। জাতীয় শোষক শ্রেণীগুলি নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করা ও তাকে আরো বিস্তৃত করার বেশী কাম্য ছিল না। আজও নেই। সুতরাং এই শ্রেণীগুলির কখনো উদ্দেশ্য হতে পারে না যে, জনগণকে সমস্ত প্রকার দমন, পীড়ন ও শোষণ থেকে মুক্ত করা হক।

অথচ ইন্দোনেশিয়ার জনসাধারণের বৃহত্তম অংশ কৃষকশ্রেণী। বিপ্লবের উচিত ছিল এই কৃষকশ্রেণীকে শোষণের হাত থেকে মুক্ত করা। তা হয় নি। আবার সংখ্যার দিক থেকে কম হলেও ইন্দোনেশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী নতুন উৎপাদনকারী শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের সাংগঠনিক সচেতনতা ও কঠোর শৃঙ্খলাবোধ আছে। সমস্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লব কার্যত শ্রমিকশ্রেণী দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত ছিল। তা হয় নি।

ফলে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্রকে চূর্ণবিচূর্ণ করা সম্ভব হয় নি। কেবলমাত্র ইন্দোনেশিয়ার প্রজাতন্ত্রের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছে। কৃষি বিপ্লবের সাহায্যে এই শোষণকারী রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই হবে আমাদের বিপ্লবের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

সে লক্ষ্য এখনো আমাদের সামনে। দ্বিধাহীন ও নিঃশঙ্কচিত্তে আমাদের সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক!

লক্ষ কণ্ঠে প্রতিধ্বনি হয়ঃ বিপ্লব দীর্ঘজীবী হক!

কমরেড?

সভার এক কোণে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনছিল শাহির। তার পাশে একটি মেয়ে। মেয়েটির হাতে আজ বই নেই, ব্যাগও না।

খালি হাতে শাহিরের পাশে দাঁড়িয়ে সে মনোযোগ দিয়ে নেতার বক্তৃতা শুনছিল। মেয়েটি রজিয়া।

ডাকল, কমরেড ?

শাহির মৃদুস্বরে বলল, বলো।

বলেই তাকাল রজিয়ার চোখের দিকে। কালো চোখের মণিতে গভীর ছায়ায় ঢাকা এক অদ্ভুত দীপ্তি।

কমরেড, আমাদের বিপ্লব কবে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছতে পারবে ? আমাদের এ জন্মে তা দেখে যেতে পারব ?

হাসল শাহির। বলল, নিশ্চয় !

রজিয়া বলল, চলো ওদিকে যাই, একটু চা খাব। বাদাম কিনে দেবে ?

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্কসভা উপলক্ষ্য করে প্রথম এসেছিল রজিয়া। সেখান থেকেই বন্ধুত্বের সূত্রপাত। ক্রমশ কখন যে অন্তরঙ্গতায় পৌঁছে গেছে তা দুজনের কেউই খেয়াল করে নি।

এখন প্রায়ই এখানে ওখানে দেখা হয় দুজনের। পার্টির একাজে ওকাজে দুজনেই সমান আগ্রহে এগিয়ে চলে। রজিয়ার আগ্রহে শাহির ছাত্রফ্রন্টের নেতৃত্বও অনেকখানি মেনে নিয়েছে। রজিয়াও শাহিরের সঙ্গে শ্রমিক ইউনিয়নের সভাসমিতিতে যাতায়াত করে।

জীবনের একই উদ্দেশ্য দুজনের ; একই আদর্শ। একই লতার দুটি পুষ্প।

চলো।

ভিড় কেটে এগিয়ে চলল দুজনে। তখনও প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে ঃ বিপ্লব দীর্ঘজীবী হক।

লাল পতাকা আর ফেস্টুনে সারা সভাক্ষেত্র ভরে গেছে। অগণিত শ্রোতা। ছেলে মেয়ে, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, তরুণ তরুণী। কৃষক আর শ্রমিক আর বুদ্ধিজীবী। বিশাল জনসমাবেশের কানায়-কানায় এক তুমুল উদ্দীপনা। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হক !

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে রজিয়া বলল, চলো শাহির, আজ আমার বাড়ি যাবে।

হঠাৎ?

কোনদিন তো যাও না। কেবল আমিই আসি। কমরেড অদিতির বক্তৃতা সবসময়েই আমাকে আবিষ্ট করে। আজ একটা অদ্ভুত উত্তেজনা অনুভব করছি।

এখনো বড্ড সেন্টিমেণ্টাল রয়ে গেছ।

হয়ত বা। তোমাদের মত কঠিন হৃদয়ের মানুষ নয় তো। সেন্টিমেণ্ট বিসর্জন দিতে পারি না।

কিন্তু বিপ্লবের পথ বড় কঠোর। কুসুমাস্তীর্ণ রাস্তায় হেঁটে কেউ বিপ্লব করতে পারে না। বড় নির্মম, নিষ্ঠুর সে পথ। সে পথের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে হয়।

তা ঠিক। তবু আজ চলো না আমার বাড়ি যাই।

কি খাওয়াবে?

তা জানি না। মাকে বলে এসেছি তোমাকে আজ নিয়ে যাব। মা অপেক্ষা করে থাকবেন।

কি ব্যাপার বলো তো? বিয়ের ঘটকালি নয় তো?

তোমাকে কে বিয়ে করবে? রসকসহীন এমন বেরসিক মানুষকে কোন মেয়ে বিয়ে করে না।

ঠিক? হাসল শাহির।

বাঃ তুমি জান না ঠিক কিনা? রজিয়ার মুখ গম্ভীর।

রজিয়া?

শাহিরের চোখের দিকে গম্ভীর বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলে তাকাল রজিয়া। জবাব দিল না।

বলো তো আজ তোমার কী হয়েছে?

ছাই হয়েছে। কিছু হয় নি। এখন চায়ের দাম চুকিয়ে চটপট চলো যাই। নইলে বাসে ওঠা যাবে না।

আজ যে একটা কাজ ছিল।

কিছু কাজ নেই।

আমার ইউনিয়নের শোভাযাত্রা নিয়ে যেতে হবে। নইলে ওরা কি মনে করবেন!

ইউসুফ ভাই তো ওই বসে আছেন। ওকে বলে আসছি, তোমাকে জরুরী কাজে আমি নিয়ে যাচ্ছি।

জরুরী কাজ?

আজ্ঞে মশাই হ্যাঁ, হ্যাঁ।

রজিয়া ছুটে গিয়ে অদূরে দাঁড়ান ইউসুফকে কি বলে এল। শাহির দাম চুকিয়ে দিল।

চলো।

রজিয়া হাত ধরল শাহিরের। অসংখ্য মানুষের ঘন ভিড় কাটিয়ে এগোতে লাগল দুজনে। শাহিরের হাতটা ধরে প্রায় টেনে নিয়ে চলেছে রজিয়া।

সভা পেরিয়ে দুজনে এল ফাঁকা রাস্তায়। সামনে বাসস্টপ দেখা যাচ্ছে।

তখনও শাহিরের একটা হাত ধরেই রেখেছে রজিয়া। তার ঠাণ্ডা হাতে সামান্য কাঁপন।

সন্ধ্যার আকাশে এক ফালি বাঁকা চাঁদ উঠেছে। অজস্র তারার রাজসভা বসতে আর দেরি নেই।

॥ ষোলো ॥

দু বছর পর ২৮শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার।

আজ বিকেলে সেনজান স্পোর্টস স্টেডিয়ামে প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ জাতির উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করবেন।

সভা আরম্ভ হবার অনেক আগে থেকেই পুরো স্টেডিয়াম ভরে গেছে। কাতারে কাতারে লোক। শুধু মাথা ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

যথাসময়ে সভা আরম্ভ হল। জনতা মুহুর্মুহু চিৎকার করে প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ জিন্দাবাদ আওয়াজ তুলতে লাগল।

মঞ্চে নেতাদের ঠিক মাঝখানে বসে আছেন বাং কর্ণ। তিনি হাত তুলে জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করছেন।

যারা কাছে বসে আছে তারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুকর্ণর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

প্রেসিডেণ্টের চেহারায় সেই ঔজ্জ্বল্য নেই। চোখের নিচে ক্লান্তির ছায়া। মুখ মলিন।

তাঁর শরীর কী সুস্থ নেই?

খবরটা যতই গোপন রাখার চেষ্টা হক, নানা সূত্র থেকে অনেক মানুষই জানে, কিছুকাল ধরে প্রেসিডেণ্টের দেহ ভাল যাচ্ছে না।

কিন্তু তাঁর চেহারা, এতটা ম্লান দেখাবে কেউ ভাবতে পারে নি। অনেকেই আশঙ্কিত হলেন।

প্রেসিডেণ্ট বক্তৃতা দিতে উঠলেন। সেই ওজস্বিনী কণ্ঠস্বর নেই, সেই আবেগ এখন অনেক মন্দীভূত। এ কী বাং কর্ণ কথা বলছেন? কিন্তু তাঁর তেজোদৃপ্ত চেহারা তো ফুটছে না।

সামান্য কিছুক্ষণ বললেন বাং কর্ণ।

থেমে থেমে, ক্লান্ত ভঙ্গীতে।

বক্তৃতা দিতে দিতেই তিনি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। দেহরক্ষীরা তাঁর পতনোন্মুখ দেহ ধরে ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল মঞ্চের ওপর। ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে এলেন তাঁর ব্যক্তিগত চীনা ডাক্তার।

সভায় দারুণ হট্টগোল পড়ে গেল। চারিদিকে চিৎকার; কী হল? কী হল? বাং কর্ণর কী হল?

সামরিক বাহিনীর তৎপরতায় ও রক্ষণাবেক্ষণে তৎক্ষণাৎ অসুস্থ প্রেসিডেন্টকে সরিয়ে নেওয়া হল।

অ্যাম্বুলেন্স ছুটল সোজা বোগোর প্রাসাদ অভিমুখে। পথে কোথায়ও দাঁড়াল না।

সভা ভেঙে দেওয়া হল।

কিন্তু চারদিকে চিৎকার আর উত্তেজনা। উদ্বেগ আর আশঙ্কা বাং কর্ণ বাঁচবেন তো?

সমগ্র জাতি বেতার বার্তার জন্য উন্মুখ হয়ে রইল। ঘোষক জানালেন; বাং কর্ণ'র জ্ঞান ফিরে এসেছে। তিনি অনেকটা সুস্থ বোধ করছেন। তাঁর জীবনাশঙ্কা নেই।

ঘোষণা যাই বলুক, জনসাধারণের জানতে বাকি নেই প্রেসিডেন্ট সুকর্ণর কিডনীর অবস্থা খুব খারাপ। মৃত্যুর নোটিস দিয়েছে।

বুধবার কাটল আশঙ্কায়।

বৃহস্পতিবার কাটল উদ্বেগে।

আশঙ্কা আর উদ্বেগ ছাড়াও সমগ্র জাতির সামনে আরেকটা দুশ্চিন্তা।

সুকর্ণর পর কী?

অরাজকতা? নাকি কমিউনিস্ট শাসন কিংবা মিলিটারী কর্তৃত্ব? কেউ সঠিক জানে না।

অনেকের দৃষ্টি চীফ অব স্টাফ জেনারেল আবদুল হারিস নাসুশনের প্রতি।

অনেকে তাকিয়ে আছেন কমিউনিস্ট নেতা অদিতির দিকে। তিনি কী বলেন, কী করেন।

কিন্তু তাঁরা দুজনেই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। দুর্ভেদ্য প্রাচীরের অন্তরালে।

শুক্রবারের সকাল। ১লা অক্টোবর।

জাকার্তা শহরে দারুণ উত্তেজনা। বাস লরী ট্যাক্সি রিক্সা সমস্ত যানবাহন বন্ধ। লোকে পাগলের মত এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে।

কী ব্যাপার?

কে একজন বলল, প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষী বাহিনীর অধ্যক্ষ লেঃ কর্নেল উনতং বিদ্রোহী হয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করেছেন।

বাড়ির মেন গেট বন্ধ করে দরজা জানালা ভেজিয়ে অনেকে রেডিও শোনার চেষ্টা করল।

অনেকক্ষণ রেডিও স্টেশন বন্ধ থাকার পর বিকেলের দিকে ঘোষণা শোনা গেল ঃ ইন্দোনেশিয়ার চূড়ান্ত বিপ্লব জয়লাভ করেছে। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্র ভেঙে দিয়ে জনগণের মুক্তির শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনসাধারণ শান্ত থাকুন।

রাস্তায় রাস্তায় হট্টগোল থামতে চাইছে না। ভারী ট্রাক গর্জন করে ছুটে চলেছে। পেছনে অসংখ্য জনতা। জনতার শোভাযাত্রা।

কম্যাণ্ডার জেনারেল আচমদ ইয়ানির বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছে বিশাল জনবাহিনী। সঙ্গে একদল সশস্ত্র সৈনিক। সাধারণ মানুষও লাঠি তরোয়াল ছুরি বন্দুক যা পেয়েছে হাতে নিয়ে ছুটেছে।

বাড়ি লক্ষ্য করে সৈনিকদল গোলাবর্ষণ করতে আরম্ভ করল। গৃহরক্ষীরাও পাল্টা জবাব দিতে কসুর করল না।

তুমুল চিৎকার।

রক্ষীদল হটে যেতে বাধ্য হল। বিদ্রোহী জনতা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে। কোথায় কম্যাণ্ডার?

এ ঘর ওঘরে তল্লাস চলে। উন্মত্ত কলরব।

এই যে, এখানে!

কম্যাণ্ডারকে বগলদাবা করে বাড়ির বাইরে নিয়ে আসা হয়। বন্দীকে নিয়ে ট্রাক চলতে থাকে বিমানঘাঁটির দিকে।

রাস্তায় বন্দীর উপর চলতে থাকে জনতার উন্মত্ত অত্যাচার। লাঠির আঘাত, তলোয়ারের আঘাত, মুষ্টিবদ্ধ হাতের আঘাত।

পথেই মারা যায় কম্যাণ্ডার।

একটা কুয়োয় মৃতদেহ ফেলে রেখে জনতা আবার ছুটতে থাকে।

নতুন শিকারের সন্ধানে।

ট্রাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আর্মি কম্যাণ্ডারের ফার্স্ট অ্যাসিস্টেন্ট মেজর জেনারেল পারমনকে।

আঘাতে আঘাতে তাঁর দেহ রক্তাক্ত।

পথেই তাঁর মৃত্যু হল।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পন্দজইতনের বাড়িও আক্রান্ত হয়েছে দুপুরের আগেই। রক্ষীরা আক্রমণ প্রতিহত করেছে।

কিন্তু বিশাল জনতার সশস্ত্র আক্রমণ বেশীক্ষণ প্রতিহত করা সম্ভব হয় নি। উত্তেজিত উন্মত্তিত জনতা বাড়ির মধ্যে ছুটে গিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে আনল তাঁকে।

তাঁকেও মরতে হল।

একে একে আরো অনেক সামরিক বাহিনীর কর্তা প্রাণ দিলেন। মেজর জেনারেল সুপ্রাত বাড়িতে ঘুমুচ্ছিলেন। তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হল।

মেজর জেনারেল হরজোনের বাড়ি আক্রান্ত হলে তিনি নিজে রাইফেল ছুঁড়তে থাকেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আহত হয়ে পড়ে যান। তাঁকে জীপে তুলে গলায় ছুরি মেরে হত্যা করা হল।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সুতেজো সিম্বো এবং লেফটেনান্ট সিয়ারে খেনউনের ভাগ্যলিপিও একই। বিনাশ থেকে তাঁরাও রক্ষা পেলেন না।

জেনারেল নাসুশনের বাড়িও আক্রান্ত হল।

বাইরে উত্তেজিত জনতার হল্লা।

রক্ষীবাহিনী সামনে গুলি চালাতে ব্যস্ত।

আক্রমণকারীদের গুলিতে জেনারেলের মেয়ে আহত হল। কিন্তু জেনারেল নাসুশনকে বিদ্রোহী জনতা ধরতে পারল না।

কোথা দিয়ে যে তিনি পালিয়ে গেলেন, কেউ টের পেল না। নৈরাশ্যপীড়িত বিক্ষুব্ধ জনতা জেনারেলকে না পেয়ে উন্মত্ত ক্রোধে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল।

দাউ দাউ আগুন জ্বলছে।

আগুন আর রক্ত।

ভ্রাতৃঘাতী রণক্ষেত্র সমগ্র জাভায়।

বেতার ঘোষণা হচ্ছেঃ সামরিক বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল অংশকে ধ্বংস করার জন্য জনগণের প্রতি বিশ্বস্ত সৈন্যবাহিনী জনসাধারণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ দিয়েছে। এই বৈপ্লবিক একতা অটুট থাকবে।

জাকার্তার রাস্তায় রাস্তায় তুমুল উত্তেজনা আর প্রচণ্ড কলরব। বিপ্লবীদের ট্রাক ছুটছে, আর ছুটছে জনতার প্রবাহ।

উন্নত্ত উচ্ছৃঙ্খল জনতার ভিড় এখানে ওখানে।

কোথাও যেন বোমা ফাটছে।

বন্দুকের গর্জন শোনা যাচ্ছে।

শাহিরও রাস্তায় ছুটে চলছিল। সঙ্গে রজিয়া।

শীতের সকালেও দুজনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে রজিয়া হাঁফাচ্ছে।

কোথায় ছুটছ শাহির?

তুমি বাড়ি যাও।

না, তোমায় ফেলে আমি যাব না।

তাহলে কথা বলো না। সঙ্গে এসো।

রুমাল দিয়ে ঘাম মুছল রজিয়া। কিন্তু একমুহূর্ত থামবার উপায় নেই। শাহির ছুটে চলেছে।

শোনো—

না। তুমি বাড়ি যাও।

উঁহু। তোমার সঙ্গে যাব।

তাহলে প্রশ্ন করো না।

বিপ্লবের অংশীদার মিলিটারী ফৌজ ভারী ভারী ট্রাক বোঝাই হয়ে গর্জন করতে করতে ছুটে যাচ্ছে।

এখানে ওখানে মিছিল।

দোকান-পাট সব বন্ধ। হাটবাজার খালি। শুধু উত্তেজনা ছাড়া কিছুই লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

কমরেড বলো না কোথায় যাচ্ছ?

দেখবেই তো।

এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরে শহরতলীতে এসে পড়ল দুজন। অসংখ্য লোক উদ্দেশ্যহীন ভাবে ছোটাছুটি করছে।

শাহির বলল, তোমার কষ্ট হচ্ছে না রজিয়া?

না।

রাগ করছ?

না।

আর বেশিদূর যেতে হবে না। এসে গেছি।' ওই যে দেখছো—

একটা লাল দোতলা বাড়ির সামনে প্রচুর ভিড়। জনতা চিৎকার করে কি যেন দাবি জানাচ্ছে।

ওখানে কী?

কথা বলো না। দেখতেই পাচ্ছ।

তুজনে ছুটে গিয়ে জনতার সামিল হয়ে দাঁড়াল। রজিয়া তখন রীতিমত হাঁফাচ্ছে।

একদল মানুষ চিৎকার করে বলছে ; জেনারেল জাহির বাইরে আসুন।

ভেতরের দরজা বন্ধ। কেউ জবাব দিচ্ছে না। দেয়ালে দেয়ালে ধ্বনির প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়েছ, প্রত্যুত্তর শোনা যাচ্ছে না।

জেনারেল জাহির, এখনো সময় থাকতে বাইরে আসুন। নতুবা বাঁচবার অধিকার হারাবেন।

চিৎকার, উন্মত্ত চিৎকার!

হঠাৎ দোতলার একটা ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল এক রমণী। মিষ্টি চেহারার একটি তন্বীদেহী তরুণী।

তার কোলে চার বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে।

মিসেস জাহির!

অনুচ্চস্বরে জনতা বলাবলি করতে লাগল।

রমণী বলল ঃ জাহির সাহেব এখানে থাকেন না। আপনারা বৃথা খুঁজছেন।

বিস্মিত জনতা কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল। তারপর কে একজন বলে উঠল, মিথ্যে কথা, আমরা বিশ্বাস করি না।

রমণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—আমি এই মেয়েটির মা। নিজের মেয়েকে কোলে নিয়ে বলছি, আপনারা বিশ্বাস করুন। জেনারেল জাহির এখানে থাকেন না।

তিনি কোথায় থাকেন?

আমি জানি না।

বেশ, তাহলে দরজা খুলে দিন। আমরা বাড়ি খুঁজে দেখব।

দরজা খুলে দিচ্ছি। কিন্তু আপনারা বলুন সকলে আসবেন না। মাত্র পাঁচ বা ছয় জন আসবেন।

কে একজন বলল, এটা হুমকি নাকি?

না। অনুরোধ।

যদি অনুরোধ না রাখা হয়?

তাহলে আমি ভেতরে চলে যাচ্ছি। আপনাদের যা খুশি তাই করুন।

জনতার মধ্যে আবার গুঞ্জন উঠল। কে একজন বলল, ঠিক কথাই বলেছেন মহিলা। জেনারেল এখানে থাকেন না।

একজন বলল, স্রেফ ধাপ্পা। ওসবে বাপু কাজ হবে না।

রজিয়া এতক্ষণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল ভদ্রমহিলাকে। ভয়ংকর বিপদের সময়ও কি শান্ত আর অবিচলিত মহিলাটি।

শাহির?

রজিয়া ক্ষীণ স্বরে ডাকল।

বলো?

এই ভদ্রমহিলা কি তোমার আত্মীয়া? কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রজিয়া।

এর নাম লখমি। জেনারেল জাহিরের স্ত্রী।

ঠিক তেমনি ফিসফিস করে রজিয়া বলল, তোমার কে হয়?

বৌদি।

রজিয়া স্তব্ধ হয়ে গেল। শাহিরের ব্যক্তিগত সংবাদ তার জানা। কিন্তু পারিবারিক খবর অনেক জিজ্ঞেস করেও জানতে পারে নি। মা বাবা ভাই বোনের পরিচয় সম্পর্কে অত্যন্ত চাপা শাহির।

তাহলে কি হবে?

দ্যাখো না।

দোতলায় মেয়েকে কোলে নিয়ে তখনও দাঁড়িয়েছিল লখমি। হঠাৎ তার চোখ পড়ল শাহিরের দিকে। মুহূর্তের জন্য তার বুক কেঁপে উঠল।

শাহির কি প্রতিশোধ নিতে এসেছে? মুহূর্তের মধ্যেই কথাটা মনে হল তার।

তাহলে তাই হক।

লখমি বলল, আমি দরজা খুলে দিচ্ছি, আপনারা আসুন।

মেয়েকে কোলে নিয়ে তরুণীর চেহারা অপসৃত হল। জনতার মধ্যে গুঞ্জন ক্রমশ উত্তেজনার আকার ধারণ করল।

নিচের গেট কে খুলে দিল।

হুড়মুড় করে একদল মানুষ ভেতরে ঢুকে গেল। রজিয়ার হাত টেনে শাহিরও ভেতরে গেল।

বিশৃঙ্খল জনতার উল্লাস উচ্চকিত হয়ে ফেটে পড়তে লাগল।

শাহির চিৎকার করে বলল, থামুন আপনারা সবাই। এ বাড়ি জাহিরের একার নয়। আমারও।

কে, কে?

সবাই তাকিয়ে দেখল শাহিরকে।

কে একজন চিৎকার করে উঠল, কমরেড শাহির! জনতার মধ্যে একজন নেতাকে আবিষ্কার করে তারা নিজেরাই পুলকে উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

কমরেড শাহির জিন্দাবাদ!

বন্ধুগণ এ বাড়ি আমার। আমার বাবা ডঃ হুসেনকে আপনারা সবাই চেনেন। এই দেখুন তাঁর ছবি।

ড্রইং রুমে ডঃ হুসেনের বিরাট ফটোগ্রাফ। ইতিমধ্যে কয়েকজন উৎসাহী লোক তন্নতন্ন করে ঘরগুলি দেখে এল। না, জেনারেল জাহির কোথায়ও নেই। কোথায়ও না।

শাহির আর রজিয়া হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

॥ সতেরো ॥

কমরেড শাহির আর রজিয়া হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেও উন্মত্ত জনতার উল্লাস তখনো অধীর উত্তেজনায় মন্দ্রমুখরিত।

লখমির কোলে তার শিশুকন্যা ভয়ে চোখ বন্ধ করে আছে। শিশুর অনুভূতি দিয়েই সে বুঝতে পারছে একটা ভয়ানক বিপদের মুহূর্ত ঘনীভূত হয়ে এসেছে।

শাহির একবার তাকাল লখমির দিকে। তার চোখে নির্ভয় নিষ্কম্প নিরুত্তেজিত প্রশান্তি।

রজিয়াও তাকাল। লখমির চোখে অদ্ভুত শান্তি দেখে বিস্মিত হল সে। জনতার অশান্ত উত্তেজনায় তার নিজেরই বুক তখন দুরু দুরু কাঁপছে।

ঠিক সে সময়ই কাণ্ডটা ঘটে গেল।

হঠাৎ দোতলার একটা ঘরে আর্তনাদের মত কান্নার গোঙানি ভেসে এল। তারপর সেই কান্নার ঢেউ জনতার ভিড় ভেদ করে ঝড়ের বেগে ছুটে এল শাহিরের কাছে। শাহির তাকিয়ে দেখল, বুড়ি রোশনারা।

বুড়ী ছুটে এসে শাহিরের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলতে লাগল, বাপ, এত দিন বাদে তুই এলি ? এত হৈ চৈ লোকজন নিয়ে এলি কেন বাপ ?

মুহূর্তের মধ্যে জনতা স্তব্ধ হয়ে গেল। সকলের বিস্মিত দৃষ্টি বুড়ি রোশনারা আর শাহিরকে ঘিরে ঘুরতে লাগল।

বাপ, তুই এত দিন বাদে এলি।

শাহির নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে বুড়ি রোশনারার দিকে। তার দু চোখ বেয়ে অশ্রুর প্লাবন।

এলি যদি তবে এত লোকজন কেন? এত হৈ হল্লা কেন? লখমি তুইও বা চুপ করে আছিস কেমন করে?

রোশনারার দুহাত নিজের দু মুঠিতে জড়িয়ে শাহির নিজের চোখের উপর রাখল। বলল, মাসী, তুমি চুপ করো। কাঁদে না। কাঁদতে নেই!

তারপর চোখ থেকে বুড়ির হাত সরিয়ে বিষণ্ণ মুখ নিয়ে হাসল। নিঃশব্দ হাসি।

একটা তুমুল উত্তেজনা এমন নাটকীয় বাৎসল্য রসের দৃশ্যে শেষ হবে, এটা বোধহয় জনতা আশা করে নি। অনেকেই বলল, হা আল্লা! চল ফিরে যাই।

জেনারেল জাহির?

কে একজন হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

এখানে নেই।

অনেকের কণ্ঠে একসঙ্গে ধ্বনিত হল।

শাহির বুড়ি রোশনারাকে ধরে রেখে জনতার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল, কমরেডস্, আপনারা যাকে খুঁজছেন সে এখানে নেই। এখানে অপেক্ষা করা বৃথা।

আপনি?

আমার কাজ অন্যত্র। আমার জন্য ভাববেন না।

কে একজন বলল, হ্যাঁ ঠিক কথা। কমরেড শাহির ইয়ুথ লীগের নেতা। চল চল।

অস্থির হুজুগে জনতার অনেকেই তখন রাস্তায় নেমে এসেছে। শাহিরের পাশে দাঁড়িয়ে রজিয়া। রজিয়াকে এবার ভাল করে লক্ষ্য করল লখমি।

একে একে জনতা গেট পেরিয়ে রাস্তায় নেমে আর এক দিকে ছুটতে লাগল। বাড়ি ফাঁকা। সুলেমান গেট বন্ধ করে হাসিমুখে এসে দাঁড়াল শাহিরের পাশে।

শাহিরের দু-গালে দু-হাত রেখে বুড়ী রোশনারা বলল, তুই এতদিন বাদে এলি বাপ? আমাদের কথা সব ভুলে গেলি?

না। ভুলব কী করে?

তবে?

কত কাজ। সে তো জান না?

কাজ কী এ বাড়িতে থেকে করা যায় না?

তুমি বুঝবে না মাসী!

বুঝব না? তোকে এই এতটুকুন ছোট থেকে মানুষ করলাম। আর তোকে বুঝব না শাহি? কী বলছিস?

রজিয়া তাকিয়ে দেখল লখমি ভেতরে চলে গেছে। সে ছলছল চোখে বুড়ী রোশনারাকে দেখছিল। হঠাৎ তার দিকেই নজর পড়ল রোশনারার। শাহিরকে জিজ্ঞেস করল, ও কে রে?

কে?

ওই মেয়েটি।

ও? ওর নাম রজিয়া।

সে তো বুঝলাম, তোর কে?

শাহির আর রজিয়ার মধ্যে চোখোচোখি হল। দুজনের মনেই প্রশ্ন জাগল, কে? তারা কে ও কি?

জোরে হাসল শাহির। বলল, আমার বন্ধু।

বুড়ী রোশনারা তাড়াতাড়ি রজিয়ার কাছে এসে পিঠে হাত রেখে বলল, এসো মা ঘরে এসো। আজ কি বিচ্ছিরি দিনে তুমি এলে। চারদিকে এমন হৈ-হৈ—

না মাসী। আমরা এবার যাব। শাহির বলল।

শাহি, বুড়ী রোশনারা করুণ কণ্ঠে বলতে লাগল, আজ সাহেবও নেই, কর্তা-মাও নেই। তাই এমন কথা বলতে তোর কষ্ট হল না। কিন্তু এমন অলুক্ষণে দিনে তোকে আমি ছাড়ব না। তোকে না, ঐ মেয়েটিকেও না।

অনেক দূরে বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ হল। একের পর এক অনেক-গুলি গর্জন। তার সঙ্গে জনতার তুমুল চিৎকার। হৈ-হট্টগোল। কতকগুলি ট্রাক ছুটে যাওয়ার বিকট আওয়াজ ভেসে এল।

তারপর আর এক দিকে তেমনি গর্জন শোনা গেল। বহুদূর থেকে হল্লা আর বন্দুকের শব্দ। ক্রোধ আর উল্লাসের ধ্বনি। সাঁজোয়া গাড়ি আর ট্রাকের শব্দ শোনা যেতে লাগল মাঝে মাঝে।

দোকানপাট বন্ধ, হাটবাজার বন্ধ, রাস্তার দুপাশে বাড়িগুলির দরজা জানালা দৃঢ়ভাবে আটকান—খাঁ খাঁ শূন্য রাস্তা।

নিঃশব্দ শহর। সেই নৈঃশব্দের বক্ষ ভেদ করে মাঝে মাঝে এখানে ওখানে, দূরে, বহুদূরে জনতার হল্লা, বন্দুকের গর্জন, ছুটন্ত ট্রাকের ঘড়ঘড় আওয়াজ। নিত্যদিনকার পরিবেশ চুরমার করে দিয়ে নতুন ভয়ংকর একটি অচেনা দিন আস্তে আস্তে কখন যে দ্বিপ্রহরে পৌঁছে গেছে সেদিকে কারও খেয়াল নেই।

রজিয়া শাহিরকে একটু ঠেলা দিয়ে বলল, চল, শহরের দিকে যাই—

হ্যাঁ।

বুড়ী রোশনারা ডাকল, লখমি, লখমি—

শোনা গেল 'যাই'। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল লখমি নেমে এসেছে একা। মেয়েকে বোধহয় শুইয়ে দিয়ে এসেছে।

শাহি বলছে এক্ষুনি যাবে—

লখমি নিঃশব্দে তাকাল শাহিরের দিকে। কোন প্রশ্ন করল না।

সকলের দিকে তাকিয়ে শাহির বলল, শোন সবাই সাবধানে থেকো। ভয় পেও না। দু-একদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সুলেমান হাসল। বলল, ভয় কী? আমারও বন্দুক আছে, জানো?

সুলেমানের পিঠে কয়েকটা মৃদু চাপড় দিয়ে শাহির বলল, দরজা জানালা সব বন্ধ করে রেখো। আমরা যাই। মাসী—

না। সবাইকে অবাক করে দিয়ে লখমির দৃঢ় কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

সবাই তাকিয়ে রইল লখমির দিকে।

তোমরা যাবে না। চারদিকে লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

হাসল শাহির। বলল, লড়াইয়ের দিনে পুরুষমানুষকে ঘরে বসে থাকতে হবে?

তাহলে আমাকেও নিয়ে চল।

কোথায়?

যেখানে তোমরা যাচ্ছ।

রোশনারা এসে হাত ধরল লখমির। কিছু বলল না।

পাগলামো করো না লখমি। এসো রজিয়া—

শাহিরের পথরোধ করে দাঁড়াল লখমি। বলল, আজ তোমরা কি আমাকে মারতে এসেছিলে?

না।

তাহলে বাঁচাতে?

জানি না। রজিয়া আর দাঁড়ায় না, চলো। মাসী আমরা যাই—

ছুটল শাহির। পেছনে রজিয়া। ওরা আর পেছন ফিরে তাকাল না।

শূন্য রাস্তা।

ওরা অনেকদূর ছুটে বাঁক ঘুরে প্রায় দৌড়তে লাগল। সবগুলো বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ। একটিও মানুষ দেখা যাচ্ছে না। কয়েকটা কুকুর আর বেড়াল ছাড়া কারোর কোন শব্দ নেই।

ওরা হাঁটতে লাগল।

কোথায় যাবে শাহির?

তোমার বাড়ি।

সেখানে কী?

তোমাকে রেখে আসব।

আমি যাব না।

একটা তীব্র বেগে ছুটে আসা মোটরের শব্দ শোনা গেল। ওরা দাঁড়াল একটা দোকান ঘরের শেডের তলায়। চান খাওয়া নেই, অতিরিক্ত দৈহিক পরিশ্রম, তথাপি শরীরের কোন অনুভূতি নেই। একটা মাত্র উপলব্ধি, সেটা মস্তিষ্কের। এই কী বিপ্লব?

গাড়িটা যেমন দুরন্তবেগে ছুটে আসছিল, তেমনি দ্রুতগতিতে চলে গেল। গাড়ির সামনে একটা বিশাল লাল পতাকা পত পত করে উড়ছিল।

পার্টির গাড়ি।

হ্যাঁ।

ওরা এবার আস্তে আস্তে এগোতে লাগল। শাহির বলল, রজিয়া চলো তোমার বাড়ি যাই। বড় খিদে পেয়েছে।

শাহিরের পিঠে মাথা রাখল রজিয়া। বলল, চলো।

কতখানি হাঁটতে হবে বলো তো?

মাইল খানেক তো বটে।

বেশ।

রজিয়ার বাড়ির সামনে যখন ওরা এসে দাঁড়াল তখন বেলা পড়ে এসেছে। দিন এখন ছোট হয়ে আসছে, তাড়াতাড়ি বিকেল গড়িয়ে আসে।

বন্ধ দরজায় জোরে আঘাত করল রজিয়া।

কোন প্রত্যুত্তর নেই।

আরো জোরে আঘাত করল। ওরা দুজনে তাকাল দোতলার দিকে। একটা জানালার পাট একটু খুলে কে যেন তাদের দেখল। তারপর তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিল জানালা।

কিছুক্ষণ পর গেট খোলার শব্দ হল। কে একজন ভেতর থেকে ডাকল, কোথায় ছিলি? চলে আয়। সঙ্গে কে?

শাহির সাহেব।

ভেতরে আসুন।

দুজনে ভেতরে ঢুকে গেল। রজিয়ার মা, প্রবীণ বয়সের স্নিগ্ধ চেহারার মহিলা।

ওরা ওপরে উঠল। শাহিরকে নিজের ঘরে নিয়ে এল রজিয়া। ছোট্ট ছিমছাম সাজান ঘর। একপাশে টেবিল চেয়ার বইএর আলমারি। অন্য পাশে সিঙ্গল খাটে সবুজ বেড্‌কভার ঢাকা বিছানা।.

বিছানায় শুয়ে পড়ল শাহির।

রজিয়া বলল, তুমি বিশ্রাম করো, আমি আসছি।

খানিকক্ষণ পর যখন রজিয়া ঘরে ঢুকল, শাহির তখন অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ফিরে গেল রজিয়া। শ্রান্ত মানুষটির প্রতি অপরিসীম মমতা অনুভব করল। জাগাল না।

মার ঘরে গিয়ে খুব মৃদু স্বরে রেডিও খুলে দিল। জাতীয় সঙ্গীত বেজে চলেছে। কিছুক্ষণ পর ঘোষণা হল ঃ বিপ্লবী পরিষদ দেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সম্পূর্ণ পরাজিত। সি. আই. এ-এর প্রভাবাধীন কিছু জেনারেল এই গণ অভ্যুত্থান ধ্বংস করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জনসাধারণ সাবধান!

রেডিও বাজতে থাকল। তেমনি মৃদু স্বরে। রজিয়া ফিরে এল তার ঘরে। শাহির তখনো ঘুমিয়ে।

শাহিরের বিশৃঙ্খল চুলের গুচ্ছে হাত রাখল রজিয়া। তার কালো সরু ভ্রূরেখায়, মুদিত চোখে, ইচ্ছে হল একটুক্ষণ ঠোঁট ছুঁইয়ে রাখে।

সাহস হল না।

ততক্ষণে আস্তে আস্তে জেগে উঠছিল শাহির। একটা হাত তুলে মাথায় রাখল, রজিয়ার হাত ছুঁল, হাতে হাত রাখল। সামান্যক্ষণ। তারপর হঠাৎ উঠে বসল শাহির। চোখ কচলে বলল, আরে রাত্রি হয়ে গেল যে। বাব্বা, এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলাম।

হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও।

হ্যাঁ। চলো।

শাহিরকে নিয়ে যখন রজিয়া তাদের বাথরুম দেখিয়ে দিচ্ছে তখন দূরে বিকট আওয়াজ শোনা গেল।

কি হল ?

হাত মুখ ধুয়ে এসো।

বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিল শাহির। জানালার একটা পাট খুলে তাকাল রজিয়া। শহরের এখানে ওখানে তুমুল সংঘর্ষের আওয়াজ কানে আসতে লাগল। বন্দুকের গর্জন, জনতার হল্লা, বিস্ফোরণের আওয়াজ, ট্রাকের শব্দ, সব মিলিয়ে এক ভয়াবহ চেহারা।

কিছুক্ষণ পর দূরে দেখা গেল কোথায় আগুন লেগেছে। আগুনের লেলিহান শিখায় আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে।

শাহির বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল রজিয়ার পাশে। দেখল আগুনের জিহ্বা লকলক করে উপরের দিকে উঠছে।

এসো।

জানালা বন্ধ করে রজিয়া তাকাল শাহিরের মুখের দিকে।—কি হচ্ছে ?

ঠিক যা হবার।

কিন্তু সংঘবদ্ধ বিপ্লব কোথায় ?

শাহির বলল, খাবার কোথায় ? খিদে পেয়েছে।

শাহিরের হাত ধরে টানল রজিয়া। নিয়ে এল ঘেরা-

বারান্দার টেবিল চেয়ারে। প্লেটে খাবার সাজান। রুটি ডিমের কারি, কলা আপেল আর দৈ।

নিঃশব্দে খেয়ে নিল শাহির। রজিয়ার খাওয়ার দিকে দৃষ্টি রাখল না। চোখের তারায় অন্যমনস্ক চিন্তিত দৃষ্টি।

খাওয়া শেষ করে রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। তারপর একটা ঢেঁকুর তুলল। বলল, অনেক খেয়ে ফেললাম। তোমার কম পড়ে নি তো?

হাসল রজিয়া। বলল, এতক্ষণে নজর পড়ল?

তোমার মা কোথায়?

ও ঘরে শুয়ে আছেন। ডাকব?

না।

রজি, রোজি—

মোলায়েম দৃষ্টিতে তাকাল শাহির। সে চোখের দিকে তাকিয়ে চোখ নত করল রজিয়া।

আমি এবার যাব।

এই রাত্তিরে? সকালে যেও।

হ্যাঁ এই রাত্রিতে। বাধা দিও না। আমাকে যেতেই হবে।

কোথায়?

প্রথমে কমিউনে। তারপর জানি না।

আমি কি করব?

সে তুমি কালকেই জানতে পারবে খবরের কাগজে।

কখন যাবে?

এক্ষুনি।

জবাব দিল না রজিয়া।

শাহির উঠে দাঁড়াল। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল। পেছনে রজিয়া। হঠাৎ সে শাহিরের শার্ট টেনে ধরল।

ছিঃ!

শোন ?

বলো।

এই কি বিপ্লবের চেহারা ? তুমি আমাকে বলে যাও।

এ বিপ্লব নয়। বিপ্লবের ভগ্নাংশ। পুরো প্রস্তুতি ছাড়া বিপ্লব হয় না—

তাহলে ?

দেখা যাক পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

গেটের দরজা খুলল শাহির।

শাহিরের পিঠে রজিয়া মাথা রাখল একটুক্ষণ। মৃদুগলায় বলল, কাল সকালে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

অপেক্ষা করো না।

বলে যাও আবার দেখা হবে।

আশা করছি। যাই রজি। দরজা বন্ধ করে দাও।

দ্রুতগতিতে অপসৃত হল শাহির। অন্ধকারে সেই ছায়ামূর্তির দিকে তাকিয়ে রইল রজিয়া।

অনেকক্ষণ পর দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

চারদিকে তখন তুমুল হট্টগোলের শব্দ।

রাস্তায় নেমে এসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত একাকী হাঁটতে লাগল শাহির। দূরে দূরে তুমুল হট্টগোল। অথচ এই রাস্তাটা একেবারে নির্জন, নিঃশব্দ।

শাহিরের মাথায় অজস্র চিন্তা। এই রাত্রি, জনতা, বন্দুকের আওয়াজ, আগুন। রাত্রি প্রভাত হবে কখন ?

সারা দেশের বুকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যে তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি চাপিয়ে রেখেছে সে রাত্রির ভোর কবে ? কবে হবে সেই সকাল ?

এ রাস্তা ও রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে একসময় সে গন্তব্য স্থলে এসে পৌঁছল।

দু তিনজন ছাড়া সেখানে কেউ নেই। শাহিরকে দেখে ওরা ভ্রূকুটি করল।

এতক্ষণ কোথায় ছিলে? একজন জিজ্ঞেস করল।

রাস্তায়।

বাঃ তোমাকে কতবার ডাকতে এসেছেন হেডকোয়ার্টার্স থেকে।

জানি।

তাহলে এত দেরি করলে?

আর কোন 'মেসেজ' আছে?

না শুধু ওরা খোঁজ করে গেলেন।

কদিনে নেতৃস্থানীয় কেউ ছিলেন না। যারা আছে, সবাই সাধারণ কর্মী। ওদের কাছ থেকে বেশী খবর পাওয়ার আশা বৃথা।

অপেক্ষা করতে হবে সকালের জন্য।

কিন্তু সকালের অনেক আগেই মিলিটারী ফৌজ বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছে। চারদিক থেকে পাহারা দিচ্ছে সাঁজোয়া গাড়ি।

তুমুল করাঘাতের শব্দে সবাই জেগে গেল।

কে?

শাহির বলল, চুপ। শত্রু। পালাবার চেষ্টা করো। লড়াই করে জিততে পারবে না।

বাইরে তুমুল করাঘাতের আওয়াজ।

পালাবার একটা পথই ছিল। লাগোয়া বারান্দা দিয়ে পাশের বাড়ি থেকে খিড়কি দরজা দিয়ে পেছনের গলি।

কিন্তু পাশের বাড়ির বারান্দায়ও মিলিটারী।

দরজা ভেঙে পড়ল মিলিটারীর পদাঘাতে।

ওরা সদলে এসে ঢুকল ভেতরে।

সবাই বন্দী হল। শাহিরকে সনাক্ত করল একজন সি আই ডি। এখন নেতাকে ধরতে পেরে মিলিটারী ক্যাপ্টেনের আনন্দের সীমা

নেই। আনন্দের আধিক্যে সে নিজেই এসে কষে তার গালে প্রচণ্ড চড় বসাল। আরো কয়েকজনের উৎফুল্ল উৎপীড়ন শুরু হয়ে গেল একমুহূর্তে।

এই চোপ!

ক্যাপ্টেন হেঁকে উঠলেন। শাহিরকে বেঁধে গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল।

তখন আকাশে ভোরের তপনকিরণ চোখ মেলেছে। শাদা মেঘের চাদরে লাল অরুণচ্ছটা।

মিলিটারী ব্যারাকে অসংখ্য লোক।

সকলকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির কিছু নেতার মুখ দেখা গেল আর দেখা গেল বহু সৈন্য, সেনাপতির মুখ।

সবাই বন্দী।

অনেকক্ষণ পর শুরু হল জেরা জবানবন্দী। অত্যাচার উৎপীড়ন। মানুষের রক্তে ভেসে গেল মিলিটারী ব্যারাকের মাটি। তবু পীড়নের দম্ভ সমানে চলতে লাগল। আর পীড়িত হয়েও পরাজিত না হবার অহমিকা।

ব্যারাকের ঠিক মাঝখানে রেডিও বেজে চলেছে তারস্বরে। একটু পর পর ঘোষণা হচ্ছে: দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদের ক্ষমতা দখলের চেষ্টা ধ্বংস করা হয়েছে। বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ না করলে তাদের সমূলে বিনাশ করা হবে। সাবধান।

একটু পর শোনা গেল: বিশ্বাসঘাতক কর্ণেল উনতাং নিখোঁজ। তাকে ধরবার জন্য সারা দেশব্যাপী জাল ফেলা হয়েছে। পালিয়ে সে নিস্তার পাবে না।

আরো পরে শোনা গেল: জেনারেল নাসুশনের নির্দেশে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী করা হয়েছে। কমিউনিস্টদের বিদ্রোহ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত।

একটি ঘোষণার পর সারা ব্যারাকব্যাপী তুমুল উল্লাস। বন্দীরা চুপ।

তারপর ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত ইন্দোনেশিয়ায় এক একটি ভয়ংকর দিন কাটতে লাগল।

হাজার হাজার মানুষ বন্দী। তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন, অসহ্য পীড়নের স্টীমরোলার।

অন্যদিকে রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারী ফৌজের বিজয়োৎসব। তারই সঙ্গে ভিন্নদলীয় জনতার উল্লাস আর হুঙ্কার।

ইন্দোনেশিয়ায় একটি যুগের অবসান।

প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ শারীরিক সুস্থ হয়েছেন। মন্ত্রীসভায় বৈঠক বসেছে। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর প্রাধান্য সর্বত্র। সেই প্রাধান্যের কাছে নতিস্বীকার করেছেন সুকর্ণ।

জেনারেল নাসুশনের পেছনে সৈন্যবাহিনীর শক্ত মানুষ জেনারেল সুহার্তো।

সুহার্তোর কাছে প্রেসিডেন্টের যাবতীয় ক্ষমতা ও মর্যাদা সমর্পণ করে যবনিকার অন্তরালে চলে আসতে হয়েছে বাং কর্ণকে। নিতান্ত বাধ্য হয়ে।

রক্তাক্ত ইন্দোনেশিয়া একটি নতুন যুগের জন্ম দিয়েছে। দিনের পর দিনের পথ হেঁটে এগিয়ে চলেছে ইতিহাস।

সে ইতিহাস কোথায় চলেছে? কোনদিকে?
